আমরা কেন আমাদের মত দেখতে

অরূপরতন ভট্টাচার্য



আমরা কেন আমাদের মত দেখতে

আমরা কেন আমাদের মত দেখতে

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আশা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া ১৩৮৪

প্রকাশক :
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
দিলীপ দে
দে প্রিণ্টার্স
১৫৭বি, মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

দাম : ছয় টাকা

উৎসর্গ

স্বদক্ষিণা

ও

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় জেনেটিক্সের উপরে লোকপ্রিয় কোনো গ্রন্থ প্রণীত হয় নি। অথচ আধুনিক এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা সকলেই দিনে দিনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি।

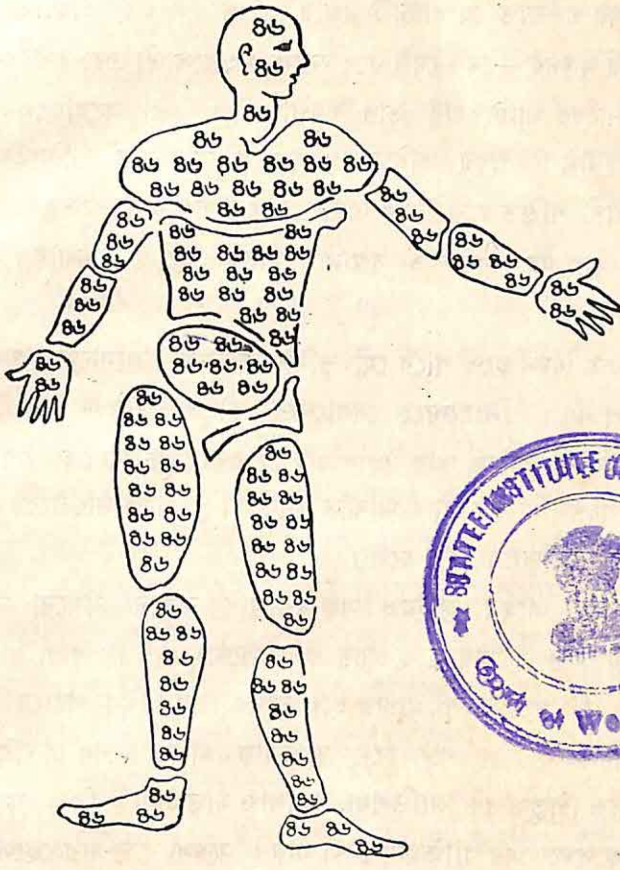
আধুনিক জেনেটিক্স বিষয় দুরূহ। জীবনের যে বৈশিষ্ট্য পরিবাহিত হয়ে চলেছে বংশপরম্পরায় তার রহস্য উন্মোচন সহজ কথা নয়। তবু ধারাবাহিক গবেষণার ভেতর দিয়ে আজ অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন হয়েছে, হচ্ছেও।

দুরূহ এই বিষয়টি সম্পর্কে সর্বসাধারণের বোধগম্য একটি গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনা কিছু দিন পূর্বে গ্রহণ করি। পথ দুর্গম এবং নতুন উদ্যম বলে সে পথ প্রায়ই দুর্গমতর বলে মনে হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রণয়নকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আশীষ কুমার দত্তগুপ্ত, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডঃ রাধাকান্ত মণ্ডল, আনন্দমোহন কলেজের ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ও শ্রীমণ্টু দের অনেক মূল্যবান পরামর্শে গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি করেন। এঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আনন্দমোহন কলেজ
কলকাতা—৯
মহালয়া, ১৩৮৪



এ সম্পর্কে আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি?

কেন এক সদ্যোজাত মানবসন্তান মানব আকৃতির সেই চির পরিচিত রূপ নিয়ে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়? তার দুটি হাত, দুটি পা, মুখাবয়ব এবং সর্বাঙ্গ আমাদের সকলেরই কনিষ্ঠ সংস্করণ, শৈশবে সে অসহায়, তখন সে পরনির্ভর, কিন্তু পরিণতিতে সে সর্বশক্তিমান এবং বুদ্ধিদীপ্ত। জীবজগতে প্রতিটি মানবসন্তানের এই রূপটি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত। মানবসন্তান মানব আকৃতি এবং মানব আচরণযুক্ত।

শুধু মানুষের কথা কেন, একটা বেড়াল বাচ্চাকে লক্ষ্য করা যাক। বেড়ালের গর্ভজাত যে বাচ্চাটি নজরে আসে সে ওই প্রজাতির আর সকলের মতনই—মেউ মেউ রবে ডাকে, মৎস্যলোভী এবং কটাচক্ষুযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের মাস্টারবাবু তার বর্ণপরিচয়ের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। সুদূর ভবিষ্যতেও যে সে জাত-কুল পরিবর্তন করে চশমাধারী পণ্ডিত হয়ে উঠবে এমন কোনো সম্ভাবনা আছে মনে হয় না। মানুষের গর্ভজাত সন্তান মানুষ হয়েই জন্মায়, বেড়াল বেড়ালই।

কিন্তু এমন হতে পারে যে, ভূমিষ্ঠ সন্তানটি আমাদের প্রত্যাশার অনুরূপ নয়। নিঃসন্দেহে সেখানেও কৌতূহল উদ্রিক্ত হবে। কেউ সৌম্যকান্ত, সুপুরুষ, তার ওপর যদি গৌরভাবযুক্ত হয় তো এক কথায় অপরূপদর্শন। আর স্ত্রী? ভাবতে দোষ কী? তাকে নাটোরের বনলতা সেনের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

কিন্তু এহেন জুটিরও সন্তান-সন্ততি কখনো কখনো সবাইকে নিরাশ করে। অবাক হওয়ার কথা সন্দেহ নেই। বাবা মা ফরসা হলে ছেলেমেয়ে ফরসা, সুন্দর হলে সুন্দর। প্রাথমিক পর্যায়ে এই-ই। তারপর ছেলেমেয়ে বড় হলে বাপ-মার মিলিত গুণের ক্রমবিকাশ—কোথাও পিতৃঋণের আতিশয্য, কোথাও মাতৃঋণ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক সময়ে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ফরসা বাপ-মার ছেলে কালো কিংবা শ্যামবর্ণ জুটির গৌরবর্ণ সন্তান।

কিন্তু এ জাতীয় ব্যতিক্রম ছাড়া সন্তান-সন্ততি যে সাধারণভাবে সব দিক দিয়েই পিতামাতার সম্পূর্ণ পরিচয়টুকু বহন করে এমন কথাও ঠিক নয়। বরণ উল্টোটাই নজরে আসে। কারো পাঁচটি সন্তান, হাতের পাঁচটি আঙুলের মত, অসমান এবং পার্থক্যযুক্ত। ফলে মাতাপিতার আকৃতিগত বা বর্ণগত সাদৃশ্যের নির্যাসটুকু নিয়ে যে সবকটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে এমনটি আশা করা চলে না। কারো চোখ মায়ের মতন টানা, কেউ হয়তো পিতার মত উন্নতনাসা। কেউ বা

অংশবিশেষের পরিচয় না নিয়ে মাতা বা পিতার যে কোনো একজনের আকৃতিগত সাদৃশ্যটুকু গভীরভাবে পেয়ে থাকে। বর্ণের বেলাতেও এ কথা সমান সত্যি। বাবা ফরসা কিন্তু মুখের গড়ন যদি ভালো না হয়, আর মা কালো কিন্তু লাবণ্যে ভরা মুখ যদি তাঁর থাকে তাহলে ভবিষ্যতে যে সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হবে, দিদিমা ঠাকুরমা তার সম্পর্কে এ রকম আশা করবেন যে, মুখখানি যেন তার মায়ের মতন হয়, কিন্তু সে যেন বাপের রংটুকু পায়। আকৃতি এবং বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও সন্তান লাভ করে মাতা বা পিতার কাছ থেকে। কিন্তু এ বিষয়ে মাত্রাভেদ যে থাকবে সে সম্পর্কে সংশয়ের কোনো কারণ ওঠে না।

মানবসন্তান যে মানুষ হয়েই জন্মায় এবং সে যে পিতামাতার মত হয়ে থাকে, আমাদের সাধারণ মানুষের এমন আশা আধুনিক বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বনির্ভর নয়। পিতামাতার অংশ যে, সে যে পিতা-মাতার পরিচয় বহন করবে এই ধারণাই আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। আর যেখানে বৈসাদৃশ্য প্রকট এবং সঙ্গতিহীন, সেখানে ?

সৃষ্টির বিকাশ, পরিণতি, এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যে পদার্থটি নিয়ন্ত্রণ করে, সেটি এ যুগের এক অবিস্মরণীয় আবিষ্কার, নাম Gene, বাংলায় একে বলতে পারি বংশাণু।

একটি মানুষকে লক্ষ্য করা যাক। তার প্রতিটি দেহকোষের কেন্দ্রে থাকে একটি করে নিউক্লিয়াস (Nucleus)। এই নিউ-ক্লিয়াসের মধ্যে আছে ক্রোমোজোম (Chromosome)।

ক্রোমোজোম কি ?

ক্রোমোজোম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরিদৃশ্যমান, তাও সকল অবস্থাতেই নয়, কোষ বিভাজনের সময়ে যখন এগুলি দৈর্ঘ্যে খর্ব হয় এবং স্থূলতা লাভ করে তখনই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এগুলি প্রত্যক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে। ক্রোমোজোম এক সূক্ষ্ম পদার্থ, অধিকাংশ প্রাণীর বা উদ্ভিদের কোষের নিউক্লিয়াসেই যা লক্ষ্য করা চলে।

আকৃতিতে এগুলি সামান্য সূতোর মত এবং কয়েকটি জৈব পদার্থ হিসেবে এরা আমাদের কাছে পরিচিত। সেইজন্যে এগুলিকে বংশসূত্র বলা হয়।

যে পদার্থে বংশের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে, মানবসন্তান মানব আকৃতি প্রকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, মেষশাবক মেষেরই অনুরূপ হয়, সিংহশিশু সিংহের স্বাভাবিক আচরণ করে— শুধু জীবজগতের বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কে কেন, উদ্ভিদ জগতের বিভিন্ন উদ্ভিদ সম্পর্কেও এই কথা— যে পদার্থে গোলাপফুল সুবাস ছড়ায়, বট-অশ্বত্থ বিশালত্ব পায়, পাতাবাহার বাহার দেখায়, ক্রোমোজোম সেই পদার্থ ই বহন করে এবং যেমন দৈর্ঘ্য, আকার, আয়তন সব কিছুরই একক আছে, তেমনই ক্রোমোজোম বংশবৈশিষ্ট্যের যে পদার্থ বহন করে, তারও একক আছে এবং সেই এককের নামই বংশাণু।

আশ্চর্যের কথা, সমস্ত জীবনের ক্ষেত্রেই বংশাণুর রাসায়নিক উপাদান গভীর সাদৃশ্যযুক্ত লক্ষ্য করা যায়। এগুলিতে আছে নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid) এবং প্রোটিনের (Protein) যৌগিক উপাদান নিউক্লিওপ্রোটিন (Nucleoprotein)। তাহলে একটি মানুষের বংশাণুর সঙ্গে একটি বেড়ালের বংশাণুর বা একটি বট বা অশ্বত্থে বংশাণুর পার্থক্য কোথায়?

সাম্প্রতিক গবেষণায় এ কথা জানা গেছে যে, দুটি নির্দিষ্ট বংশাণুর মধ্যে পার্থক্য এদের নিউক্লিক অ্যাসিড উপাদানটির উপরে নির্ভর করে। নিউক্লিক অ্যাসিড দুই প্রকার : ডি এন এ (DNA) এবং আর এন এ (RNA)। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিউক্লিক অ্যাসিড ডি এন এ বা শব্দটি হল ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribonucleic acid)। এটিই বংশাণুর প্রধান রাসায়নিক উপাদান। ডি এন এ অণুটি অসংখ্য নিউক্লিওটাইড (Nucleotide) দ্বারা গঠিত। পিউরিন (Purine) অথবা পিরিমিডিনের সঙ্গে (Pyrimidine) সঙ্গে যুক্ত ডিঅক্সিরিবোজ

শর্করা এবং ফসফরিক অ্যাসিডের যৌগগুলিকে নিউক্লিওটাইড বলা হয়। এই নিউক্লিওটাইড বিভিন্ন সমবায়ে যুক্ত হয়ে একটি ডি এন এ অণু গঠন করে। এই নিউক্লিওটাইডগুলির বিভিন্ন সজ্জাক্রমই (Sequence) নানাবিধ সংকেতের কাজ করে।

মাত্র চার ধরণের নিউক্লিওটাইড দিয়ে কী ভাবে সম্ভব তা ?

ইংরেজী বর্ণমালার ২৬টি বর্ণের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টা নিঃসন্দেহে বোধগম্য হবে। বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণ নিয়ে ভাবব্যঞ্জক কত অসংখ্য শব্দ, অজস্র বাক্য এবং বিভিন্ন অনুচ্ছেদ তৈরী করা যায়। কিন্তু এই সমস্ত শব্দ, বাক্য এবং অনুচ্ছেদ ব্যক্ত করা সম্ভব মর্সকোডের টরে-টক্কা, কেবলমাত্র এই দুটি ভিন্ন সংকেত দিয়ে।

দেহের প্রতিটি কোষে কটি ক্রোমোজোম থাকে? এর উত্তর নির্ভর করে এক এক প্রজাতির উপরে। বিভিন্ন প্রজাতিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ভিন্ন, কিন্তু এক প্রজাতিতে ক্রোমোজোম-সংখ্যা সাধারণভাবে নির্দিষ্ট। মানবদেহের দেহকোষে ক্রোমোজোম-সংখ্যা বহু দিনের বিতর্কিত প্রশ্ন। অবশেষে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে জে এইচ জিয়ো (J. H. Tjio) এবং এ লিভান (A. Levan) নামে দুইজন সুইডিশ বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে, মানুষের প্রতিটি দেহকোষে ক্রোমোজোম-সংখ্যা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ৪৬টি। কিন্তু ৪৬টি ক্রোমোজোম বলে নয়, আমরা এর সঙ্গে পরিচিত হব দেহকোষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম হিসেবে। এর কারণ আছে। প্রতি জোড়া ক্রোমোজোমের একটি মাতার কাছ থেকে, অন্যটি আসে পিতার কাছ থেকে। দেহকোষের এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে এক জোড়ায় স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। সেটি মুখ্যত লিঙ্গ নির্ধারক। কাজেই তার নাম যৌন ক্রোমোজোম (Sex chromosome), বাকি ২২ জোড়া অযৌন ক্রোমোজোম বা (Autosome) অটোজোম। দেহকোষের সেই ক্রোমোজোমগুলি যেগুলি আমাদের দৈহিক, মানসিক এবং শারীরিক বিকাশের জন্যে দায়ী আর যৌন ক্রোমোজোম দায়ী প্রধানত লিঙ্গ

নির্ধারণের (Sex determination) জন্যে। মানুষের দেহকোষের যৌন ক্রোমোজোম দুটিকে X ও Y দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আকৃতি ও আয়তনে X ও Y ক্রোমোজোম দুটির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। স্ত্রীলোকের দেহকোষে দুটি X ক্রোমোজোম এবং পুরুষের দেহকোষে থাকে একটি X ও একটি Y ক্রোমোজোম। প্রতি স্ত্রীলোক মাতা ও পিতার প্রত্যেকের কাছ থেকেই লাভ করে একটি করে X ক্রোমোজোম কিন্তু প্রতি পুরুষ মাতার নিকট X ক্রোমোজোম এবং পিতার নিকট থেকে Y ক্রোমোজোম গ্রহণ করে। তাই নারী ও পুরুষের যৌন ক্রোমোজোমের গঠন যথাক্রমে XX ও XY।

ক্রোমোজোমেই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বংশাণু সজ্জিত থাকে। কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত বংশাণু নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের সুনির্দিষ্ট অংশে অবস্থান করে। যে বংশাণু যৌন ক্রোমোজোমে অবস্থিত তাকে লিঙ্গ অনুগামী বংশাণু এবং যে বংশাণু অ-যৌন ক্রোমোজোমে অবস্থিত তাকে অলিঙ্গ অনুগামী বংশাণু বলে। বিভিন্ন বংশাণু একত্রে এবং পরিবেশের প্রভাবের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবিত প্রাণীর জীবদ্দশার বিভিন্ন বিকাশ পর্বের নিয়ন্ত্রণ করে। এরা অনেকটা অর্কেস্ট্রা পার্টিতে সৃষ্ট ধ্বনিব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের মত—সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবেশিত সুরমূর্চ্ছনা, সকলেরই কাজ আছে যেমন সেখানে, তেমনি বংশাণুরা। সুসমঞ্জস একটি ব্যক্তিত্বের জন্যে প্রত্যেকেই অপরিহার্য এবংপ্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট অবদান আছে।

বংশাণু যে বৈশিষ্ট্যকে বহন করে তা যে সব সময়ে সন্তান-সন্ততির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তা নয়। দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য, মনে করা যাক। বাবা মার এক বংশের সকলের চোখের মণি বাদামী, অন্য দিকের সকলের নীল—এই দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যদি এমন হয় যে, সমস্ত সন্তান-সন্ততির বহিঃপ্রকৃতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ, তাহলে সেই বৈশিষ্ট্যকে প্রকট (Dominant) বৈশিষ্ট্য এবং যে বৈশিষ্ট্য অপ্রকাশিত থাকে, তাকে প্রচ্ছন্ন (Recessive) বৈশিষ্ট্য বলে। প্রকট

বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রকট বংশাণু এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন বংশাণু। সাধারণ ক্ষেত্রে বাবা মা দুজনের কাছ থেকেই পুত্র কন্যা যদি প্রচ্ছন্ন বংশাণু পায় তাহলে, নামে প্রচ্ছন্ন হলে কি হবে, সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দুজনের কাছ থেকে প্রকট বৈশিষ্ট্য নিলে প্রকট বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হবে বহিঃপ্রকৃতিতে। কিন্তু একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত বংশাণু লাভ না করে যদি সন্তান-সন্ততি একজনের কাছ থেকে প্রকট বংশাণু এবং অন্যজনের কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন বংশাণু লাভ করে তখন? তখন প্রকট বংশাণুর বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ প্রকট বংশাণুর সঙ্গে প্রচ্ছন্ন বংশাণু পাশাপাশি থাকলে প্রচ্ছন্ন বংশাণুর প্রকাশ ঘটে না, প্রকটই প্রকাশিত হয়।

আলোচিত এই বংশাণুর আয়তন কত, ওজনই বা কি রকম—এ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সহজ হিসেবে দেখা গেছে যে, একটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহে সমস্ত ক্রোমোজোমের আয়তন প্রায় ৪৬ সি সি এবং এর ভর ২ আউন্সেরও কম। একটি পূর্ণ বয়স্ক মানুষের আয়তন এবং ওজনের তুলনায় এ পরিমাণ নিঃসন্দেহে উপেক্ষা করা চলে। কিন্তু বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই, এই অতি সামান্য পরিমাণ বস্তুই নিজের চতুর্দিকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী ওজনবিশিষ্ট জীবদেহের আমাদের পরিচিত আবরণটি গড়ে তোলে এবং শুধু আবরণ গড়ে তোলাই সব কথা নয়, এই অতি সামান্য বস্তুই জীব দেহের সৃষ্টি, বিকাশ এবং সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।

যেখানে ক্রোমোজোম ওজনে এবং আয়তনে এত সামান্য সেখানে বংশাণুতে যে পরিমাণ ডি এন এ আছে, তা যে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর এতে কোনো সন্দেহই থাকে না। কিন্তু বংশাণুর সেই সামান্য ডি এন এ অত্যন্ত জটিল প্যাঁচযুক্ত। যদি তার প্যাঁচ আলগা করে তাকে লম্বালম্বি-ভাবে সাজানো যেত, তাহলে অবাক বিস্ময়ে সকলে দেখতে পেত, মানুষের দেহের একটিমাত্র কোষ থেকে যতটা ডি এন পাওয়া যায়, দৈর্ঘ্যে সে প্রায় ৬ ফুট পরিমাণের সমান। একটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের

তাঁর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে তিনি ডারউইনের মতাবাদকে সম্পূর্ণ বলে মেনে নিতে পারেন নি। এই অসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে মেনডেল তাঁর কৃতিত্বের নিদর্শন রাখেন।



দুর্ভাগ্যের কথা ডারউইন কিন্তু মেনডেল বা মেনডেলের গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদ রাখতেন না। ১৮৬৬ সালে Genetics এ বংশধারার বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত মেনডেলের প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার ছটি বছর পরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ডারউইনের দ্য অরিজিন অব স্পিসিজের ষষ্ঠ সংস্করণে ডারউইন বংশধারার বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত বিভিন্ন রহস্য প্রায় অজ্ঞাত রয়ে গেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি

বলেন যে, কেউ বলতে পারে না, এক বা ভিন্ন প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে কেন কখনো কখনো একই ধরণের বৈচিত্র্য নজরে আসে এবং কে বলবে, সে বৈচিত্র্য কেন বা কখনো লক্ষ্য করা যায় না। শিশু কেন অনেক সময়ে তার ঠাকুর্দা বা ঠাকুরমার কোনো এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়?

ডারউইনের এই জিজ্ঞাসা সনাতন জিজ্ঞাসা—সকলেরই চিরকালের বিস্ময় সেখানে।

মেনডেল মটর (Pisum sativum) নিয়ে সঙ্কর প্রজননের ক্ষেত্রে ডারউইনের বংশধারার বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত এই ধরণের প্রশ্নেরই যথোচিত উত্তর প্রদান করে জেনেটিকসের এই দিকটির রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

মেনডেল যে তাঁর গবেষণায় মটরকে গবেষণার উপকরণ হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন—এ নেহাৎ আকস্মিক ঘটনা নয়। সঠিক উপকরণটিকে বেছে নেওয়ায় গবেষকের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় আছে। এবং তার ওপরে গবেষণার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। সঙ্কর প্রজননের (Hybridization) ক্ষেত্রে মটর সব দিক দিয়েই অনুকূল বলে তিনি স্ব ইচ্ছায় মটরকে তাঁর গবেষণার আদর্শ উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

মেনডেল মটর উদ্ভিদের যে সাত জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সঙ্কর প্রজনন করেছিলেন, তারা হল :

১. মসৃণ এবং কুঞ্চিত বীজ
২. হলুদ এবং সবুজ রংয়ের বীজ
৩. বীজের স্বচ্ছ আচ্ছাদনের সাদা এবং ধূসর রং
৪. পক্ব শুঁটির (Pod) স্ফীত এবং চ্যাপটা আকার
৫. অপক্ব শুঁটির সবুজ এবং হলুদ রং
৬. উদ্ভিদে ফুলের বিন্যাস
৭. লম্বা এবং বামন উদ্ভিদ

মেনডেল তাঁর গবেষণায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মটর উদ্ভিদের মধ্যে সঙ্কর সৃষ্টি করে পরবর্তী বংশপর্যায়ে তার ফলাফল লক্ষ্য করতেন। এবং তার একটি সঠিক বিবরণী রাখতেন। মেনডেল লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোনো মটর উদ্ভিদের বীজ বর্ণে হলুদ, কোনোটির সবুজ, কোনোটির গাত্র মসৃণ, কোনোটি আবার কুঞ্চিত। কোনো উদ্ভিদটি আকৃতিতে দীর্ঘ, কোনোটি খর্ব। মেনডেল এদের মধ্যে বিভিন্ন সমবায়ে সঙ্কর প্রজনন ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন নিয়মিত এবং অভিনব ফলাফল দেখতে পেয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। মেনডেল সেই সব ফলাফল থেকে এই রকম একটা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, বিশেষত্বগুলির প্রত্যেকটির নিয়ামক নির্দিষ্ট। এই নিয়ামককে পরবর্তীকালে জিন (Gene) বা বংশাণু নামে অভিহিত করা হয়।

যে মটরের বীজের বর্ণ সবুজ তা কিসের জন্যে? যার বীজের বর্ণ হলুদ, কোন্ পদার্থ সেই বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে?

মটরের বীজের সবুজ রংয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী কোনো নির্দিষ্ট বংশাণুর জন্যেই মটরের বীজ সবুজ রংয়ের হয় এবং যেখানে মটরের বীজের রং হলুদ, সেখানে হলুদ রংয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণুতে মটরের বীজের রং হলুদ। আকৃতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ও সকল ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত বংশাণু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মেনডেল আরও বললেন যে, প্রত্যেক উদ্ভিদে প্রতিটি বিশেষত্ব প্রকাশের জন্যে এক জোড়া বংশাণু থাকে, যার একটি আসে স্ত্রী-জননকোষ থেকে, অন্যটি পুরুষ-জননকোষ থেকে। এই বংশাণু দুটি অভিন্ন, না হয় বিপরীত। বীজের সবুজ এবং হলুদ বর্ণের বৈশিষ্ট্য নির্ধারক বংশাণুর দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখা যাক। যদি একটি মটরের বীজের বর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণু দুটির প্রত্যেকটিরই বৈশিষ্ট্য হলুদ রং সংক্রান্ত হয় বা প্রত্যেকটিরই সবুজ রং সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য থাকে, তাহলে তারা অভিন্ন, আর যদি একটি সবুজ হয় অন্যটি হলুদ, তাহলে তারা ভিন্ন।

বীজের বর্ণ নিয়ন্ত্রণে দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বংশাণুর ক্ষেত্রে ওই দুটি

বর্ণের মিলিত ফলটিই যে উৎপন্ন উদ্ভিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে—তা নয়, এর একটি অন্যটিকে অতিক্রম করে উৎপন্ন উদ্ভিদের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্যকেই সঞ্চারিত করতে পারে। যেমন বিশুদ্ধ হলুদ বীজ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের সঙ্গে বিশুদ্ধ সবুজ বীজ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের সঙ্কর প্রজননের ফলে পরবর্তী বংশক্ষেত্রে হলুদ বীজ উৎপন্ন হবে। এখানে হলুদ রং উৎপন্নকারী বৈশিষ্ট্যের বংশাণু প্রকট বা প্রবল এবং সবুজ রংয়ের বৈশিষ্ট্যের বংশাণু প্রচ্ছন্ন বা অপ্রবল।

মেনডেল তাঁর বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের প্রকট বংশাণুকে ইংরেজী ব্যঞ্জনবর্ণের বড় অক্ষরের A এবং প্রচ্ছন্ন বংশাণুকে ছোট অক্ষরের a দিয়ে নির্দিষ্ট রাখেন। পুং বা স্ত্রী – উদ্ভিদের কাছ থেকে একটি করে বংশাণু নিয়ে কোনো বৈশিষ্ট্যের এক জোড়া বংশাণুর যে সম্মিলন ঘটবে, বিশুদ্ধের ক্ষেত্রে তা হবে হয় AA না হয় aa। যেখানে প্রকট সেখানে AA, প্রচ্ছন্নে aa, সঙ্করের ক্ষেত্রে Aa। এই পদ্ধতিতে মেনডেল তাঁর গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন। বিশুদ্ধ প্রবলধর্মী (AA) বা সংকর (Aa) মটর গাছের ক্ষেত্রে বহিঃ-প্রকাশ হবে প্রকটের এবং বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্নের (aa) ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে প্রচ্ছন্নটিকে।

প্রজনন সংক্রান্ত পরীক্ষায় প্রকৃতপক্ষে প্রথম জননকে প্রতিনিধিত্ব করছে কোনো বৈশিষ্ট্যের বিশুদ্ধ প্রকট এবং বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন যে উদ্ভিদ P_1 (Parental generation) প্রতীক দ্বারা তাদের চিহ্নিত করা হয়। এদের স্বনিষেকে উৎপাদিত সঙ্কর উদ্ভিদগুলিকে F_1 (First filial generation) প্রতীক দ্বারা এবং সঙ্করগুলির সাহায্যে যে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় তাকে F_2 (Second filial generation) প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

এবার বীজের হলুদ রং বিশুদ্ধ প্রকটের সঙ্গে সবুজ রং বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্নের প্রজননে অর্থাৎ P_1 থেকে F_1 পর্যায়ে অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে দেখা যাক :

P_1 : হলুদ সবুজ

AA aa

F_1 Aa aA

হলুদ হলুদ

অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন বংশাণুর সম্মিলন ঘটবে। কিন্তু বীজের হলুদ রংয়েরই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে যদিও প্রচ্ছন্ন বংশাণু আছে সঙ্গে সঙ্গে। তার কার্যকারিতা অপ্রকাশিত, কিন্তু তার উপস্থিতি বর্তমান।

এবার মেনডেল ছুটি F_1 সঙ্কর গাছকে নিষেক করিয়ে তার পরের অর্থাৎ F_2 পর্যায়ে নীচের ফলাফল পান :

F_1 : হলুদ হলুদ

Aa Aa

F_2 : AA Aa aA aa

হলুদ হলুদ হলুদ সবুজ

এখন (Genotypic ratio) বংশাণুগত বিভিন্ন সমবায় ১ : ২ : ১

কিন্তু AA = প্রকট

Aa = প্রকট

aA = প্রকট

এবং aa = প্রচ্ছন্ন

সুতরাং বহিঃপ্রকাশগত (Phenotypic ratio) প্রকট এবং প্রচ্ছন্নের অনুপাত 3:1। এবার মটর গাছের ছুটি চরিত্রের প্রজননের ফলাফল নিয়ে বিষয়টিকে আলোচনা করা যাক। এর প্রত্যেকটিতেই

বীজের রংয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী দুটি ভিন্ন ধরণের বংশাণু আছে। তারা হলুদ এবং সবুজ বীজের রং নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণু।

একটি নির্দিষ্ট বিশেষত্ব নিয়ন্ত্রণকারী প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কিন্তু বিনষ্ট হয় না। তার কার্যকারিতা অপ্রকাশিত কিন্তু তার উপস্থিতি বর্তমান।

দুটি উদ্ভিদ নেওয়া যাক। এর প্রত্যেকটিতেই বীজের রংয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী দুটি ভিন্ন ধরণের বংশাণু আছে। তারা হলুদ এবং সবুজ বীজের রং নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণু।

এই দুটি উদ্ভিদের প্রজননের ফলে বীজের রং নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণুর চার রকমের সমবায় সম্ভব বলে মেনডেল নির্দেশ দেন।

ক. প্রথম উদ্ভিদের বীজের হলুদ রং নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণুর সঙ্গে দ্বিতীয় উদ্ভিদের বীজের হলুদ রং নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণু সম্মিলিত হতে পারে।

খ. প্রথম উদ্ভিদের বীজের হলুদ রং নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণুর সঙ্গে দ্বিতীয় উদ্ভিদের বীজের সবুজ রং নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণুর সম্মিলন ঘটতে পারে।

গ. প্রথম উদ্ভিদের বীজের সবুজ রং নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণুর সঙ্গে দ্বিতীয় উদ্ভিদের বীজের হলুদ রং নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণুর সম্মিলনের সম্ভাবনা আছে।

ঘ. প্রথম উদ্ভিদের বীজের সবুজ রং নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণুর সঙ্গে দ্বিতীয় উদ্ভিদের বীজের সবুজ রং নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণুর সম্মিলনের সম্ভাবনা।

এর মধ্যে চতুর্থ ক্ষেত্রেই সবুজ বীজ উৎপন্ন হবে। অর্থাৎ তখন প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

ব্যাপারটা অনেকটা দুটি ভিন্ন মূল্যের পয়সা নিয়ে হেড টেল করার মত। যদি একটি আধুলি হয়, অন্যটি সিকি এবং যদি কেউ একই সঙ্গে দুটি মুদ্রার হেড টেল করে চলে, তা হলে অবস্থা কী রকম দাঁড়ায় ?

চার রকমের সম্ভাবনা সেখানে :

ক. আধুলির হেড, সিকির হেড

খ. আধুলির হেড, সিকির টেল

গ. আধুলির টেল, সিকির হেড

ঘ, আধুলির টেল, সিকির টেল

নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ত্বটি ভিন্ন বংশাণুর অনুরূপ।

মেনডেল আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিভিন্ন ধরণের বিশেষত্ব-গুলি পরস্পর স্বাধীনভাবে (Independent assortment) বংশানুসৃত হয়।

মটর নিয়ে প্রজনন সংক্রান্ত গবেষণায় লব্ধ মেনডেলের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত একদিক দিয়ে অনেকটা ডালটনের (Dalton) অ্যাটমিক থিওরির মত। মোটামুটি ঠিক কিন্তু খুঁটিয়ে বিচার করলে সর্বাংশই নির্ভুল এমন গণ্য করা চলে না।

মেনডেলের দীর্ঘ গবেষণার পরবর্তী পর্যায়ে গবেষণালব্ধ ফল বিদগ্ধ সমাজের সামনে উপস্থাপিত করা এবং স্বীকৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। রীতি অনুসারে এই স্বীকৃতি অস্বীকৃতির উপরে গবেষণার সার্থকতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। মেনডেল ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্র ব্রুন সোসাইটিতে (Brunn) তাঁর বক্তব্যের প্রথম অংশ সর্বসমক্ষে পেশ করেন। এক মাস বাদে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আলোচনা সভায় তিনি তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ করলেন। অবশেষে মেনডেল তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফল সযত্নে লিপিবদ্ধ করেন এবং শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে তা বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ্‌ কার্‌ল-উইলহেল্‌ম ফন নাগেলিকে (Karl Von Nageli) পাঠিয়ে দেন। নাগেলি মেনডেলের গবেষণায় উৎসাহিত হলেন না। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল ব্যাপক। সেই ব্যাপক ক্ষেত্র থেকে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল। ফলে মটর উদ্ভিদ্‌ অবলম্বনে

সত্যের সন্ধানে তিনি তেমন কোনো কৃতিত্ব দেখতে পেলেন না। তা ছাড়া মেনডেল ছিলেন একজন অজ্ঞাত সখের উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্‌।

সম্ভবত নাগেলির মন্তব্যে মেনডেল নিরুৎসাহ হন। তিনি গবেষণা কার্য থেকে সরে এসে মঠের কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করেন।

মেনডেলের সিদ্ধান্তের মধ্যে সুনির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র বংশাণুর কথা আছে। যদিও তিনি এ জাতীয় কোনো পদার্থ শ্রোতৃমণ্ডলীকে দেখাতে পারেন নি, কিন্তু তিনি এগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে এত সচেতন ছিলেন যে, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে তিনি এগুলিকে সত্য বলে উপস্থিত সবাইকে একরকম মেনে নেওয়ার কথা বলেছিলেন।

কিন্তু প্রমাণ ছাড়া বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হবে কি ভাবে? তাছাড়া মেনডেল তাঁর বক্তব্যে উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বীজগণিতের প্রথা বহির্ভূত এক বিচিত্র প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে শ্রোতাদের বিষয়টি অনুধাবনে অসুবিধা হয়েছিল। সঙ্কলিত তথ্যের মধ্যেই যে বক্তব্যের সত্যতা আছে তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি। তাই মেনডেল যখন তাঁর বক্তব্য পেশ করেন, তখন শ্রোতাদের ভূমিকা ছিল নির্বাক দর্শকের মত।

মেনডেল ব্রুন সোসাইটিতে বক্তব্য পেশ করেন ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬৬-তে সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর সে বক্তব্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু বক্তব্য পেশ করবার সময় যেমন অবস্থা, প্রকাশিত এবং মুদ্রিত বক্তব্যের বেলাতেও অনুরূপ অবস্থা। সোসাইটির সদস্যেরা মেনডেলের গবেষণা পত্রটি মুদ্রিত করে বিষয়টির উপরে যবনিকাপাত করেছিলেন।

মেনডেলের বংশধারা-সূত্র মানবজীবনে বংশপরম্পরায় আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করি। মাথায় কোঁকড়ানো চুল এবং সিধে চুলের দৃষ্টান্ত নিয়ে বিষয়টা পরিস্ফুট করে তোলা যাক।

একটি মেয়ে, তার ছিল মাথায় কোঁকড়ানো চুল। সেই কোঁকড়ানো চুলকে অবলম্বন করে তার বংশধারার বিভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করা যাক।

মেয়েটির মায়ের বাড়ীর দিকের মা, মাসী, দিদিমা প্রত্যেকেরই

মাথায় কোঁকড়ানো চুল। কিন্তু পিতৃকুলের সকলের মাথায় একেবারে সহজ সরলরেখার মত চুলের বৈশিষ্ট্যহীন পরিচয়। তাহলে মেয়েটির কোনো নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট অংশে কোঁকড়ানো এবং সিধে চুলের বৈশিষ্ট্যনির্ধারক ভিন্ন বংশাণু ছিল। কিন্তু কোঁকড়ানো এবং সিধে চুলের মধ্যে কোঁকড়ানো চুলের প্রকট বৈশিষ্ট্য, সেইজন্যেই মেয়েটির মাথায় কোঁকড়ানো চুল।

এবারে এই কোঁকড়ানো চুল মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা এমন একটি ছেলের সঙ্গে যার মাথাতেও কোঁকড়ানো চুল। কিন্তু দুঃখের কথা, ছেলেটির বাবা মা নেই, বাবা মায়ের কোনো পরিচয়ও জানা নেই। এ কথা বলার কারণ ছেলেটির চুলের বংশগত পরিচয় সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞাত রাখা। কিন্তু বিবাহের পর সন্তানাদির চুল দেখে নির্ণয় করা যাবে ছেলেটির ওই অজ্ঞাত পরিচয়।

ধরা যাক, চারটি ছেলেমেয়ে এদের। এর মধ্যে প্রথম তিনজনের মাথায় কোঁকড়ানো চুল, কিন্তু শেষের যেটি, তার চুল সিধে। তাহলে কোঁকড়ানো চুল যে মেয়েটির সঙ্গে কোঁকড়ানো চুল ছেলেটির বিবাহ কার্যাদি সম্পন্ন হল মাথার চুলের দিক দিয়ে তার বংশগত পরিচয় নির্ণয় করা যাক।

এর বংশগত পরিচয় জানা যাবে শেষ সন্তানটির দিকে তাকিয়ে।

শুধু কোঁকড়ানো চুল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, উৎপন্ন সব কটি সন্তান-সন্তনির চুল কোঁকড়ানো হওয়ার সম্ভাবনা যতটা সিধে হওয়ারও ঠিক ততটা অর্থাৎ ফিফটি ফিফটি বা পঞ্চাশ পার্সেন্ট। সুতরাং মেয়েটির বরের কোনো নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের সুনির্দিষ্ট অংশে যদি অভিন্ন কোঁকড়া চুলের বংশাণু থাকত তাহলে মেনডেলের সূত্র অনুসারে সবকটি সন্তান-সন্ততিই কোঁকড়ানো চুল পেত। কিন্তু কনিষ্ঠ সন্তানটির জন্যে এ কথার যাথার্থ অস্বীকৃত হচ্ছে।

এইভাবে মানবজীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বংশাণু নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু শুধু বংশাণু নয়, পরিবেশও মানবজীবনকে অনেকটা প্রভাবিত করে।

তিন

মেনডেলের বক্তব্য ব্রুন সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরেও দীর্ঘকাল তা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। ব্রুন সোসাইটিতে গবেষণাপত্র উপস্থাপনের পরের ঘটনা। মেনডেল মঠের অধ্যক্ষ মনোনীত হলেন। পরিচালন সংক্রান্ত দায়িত্বভারে তিনি তখন এতই বিব্রত হয়ে পড়লেন যে, যে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা পরবর্তীকালে জেনেটিকসের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁকে দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছিল, সেই বিদ্যার প্রতি তখন তিনি আর যথেষ্ট মনোযোগ দেবার অবকাশ পেলেন না।

ব্রুন সোসাইটি নীরব। ইউরোপের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্ নাগেলির মন্তব্যেও উৎসাহজনক কিছু ছিল না। "আপনার কাজ কিছুটা সম্ভাবনাপূর্ণ"— নাগেলির এই মন্তব্য মেনডেলকে উৎসাহিত করতে পারল না। নাগেলি তাঁর প্রিয় গবেষণার উপাদান Hawkweed নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে মেনডেলকে অনুরোধ জানালেন। মেনডেল তা নিয়ে চেষ্টা করেও দেখেছিলেন। কিন্তু নাগেলি এবং মেনডেল কেউই এই উপাদানটি নিয়ে তেমন কিছু একটা করে উঠতে পারেন নি।

পরে মেনডেল গবেষণার ক্ষেত্রে মৌমাছিকে নিয়ে আসেন। কিন্তু এটিও অনুকূল নির্বাচন নয়। ফলে মেনডেলের জীবদ্দশায় মেনডেলের কীর্তি অস্বীকৃতই রয়ে গেল।

অথচ সেই একই সিদ্ধান্তের দিকে নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর

হচ্ছিলেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। যে পথটি ধরে তাঁরা এই অভিনব বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হন তা হল পরিব্যক্তি (Mutation)।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ। মেনডেলের জন্মের প্রায় ৩০ বছর আগের কথা। ম্যাসাচুসেট্সের এক কৃষিজীবী তাঁর মেষের পালে এক অস্বাভাবিক আবির্ভাব লক্ষ্য করেন। সাধারণ মেষের সঙ্গে আকৃতিগত তুলনায় এই মেষশাবকটির পাগুলি ছিল অস্বাভাবিক ছোট। বুদ্ধিমান রাইটের মাথায় অকস্মাৎ নতুন চিন্তার উদয় হল। সাধারণ আকারের মেষগুলির দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সেগুলি খামারের নীচু পাথরের প্রাচীর অনায়াসে অতিক্রম করে। তা রাইটের দুর্ভাবনার কারণ। কিন্তু হ্রস্বপদ মেষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। ফলে হ্রস্বপদ মেষের প্রজননের কথা তাঁর মনে হল। চিন্তাকে বাস্তব প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিব্যক্তির সন্ধান শুরু হল।

শুধু এই-ই নয়, পরিব্যক্তির সন্ধান শুরু হল দিকে দিকে। উদ্ভিদ্ প্রজননে পরিব্যক্তির প্রয়োগে মারকিন উদ্যানবিদ্ লুথার বারব্যাঙ্ক সাফল্য লাভ করলেন। তিনি এমন সব উদ্ভিদ্ উৎপন্ন করলেন যেগুলি কোনো না কোনো বিষয়ে পুরোনো পরিচিত উদ্ভিদের তুলনায় উৎকৃষ্টতর ছিল।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রজননের পরিমণ্ডলে এক আশ্চর্য সমপাতন লক্ষ্য করা যায় মেনডেলের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হবার প্রায় ৩৫ বছর পরে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রজনন সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্তে মেনডেল উপনীত হয়েছিলেন, সেই একই সিদ্ধান্তে একই সময়ে উপনীত হলেন তিনজন বিজ্ঞানী পরস্পর নিরপেক্ষভাবে। নিঃসন্দেহে এ এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অথচ মেনডেলের গবেষণা এঁদের দৃষ্টির অগোচরেই ছিল। কিন্তু গবেষণার কার্যাবলী প্রকাশের জন্যে যখন তাঁরা পূর্ববর্তী গবেষকদের প্রকাশিত বিবরণীর অনুসন্ধান করছিলেন, তখনই মেনডেলের প্রকাশিত বিবরণী এঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে সমস্ত কৃতিত্বটুকু মেনডেলকে অর্পণ করে মেনডেলকে

জেনেটিকসের জনক হিসেবে তাঁরা স্বীকার করে নিলেন। মেনডেলের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁরা তাঁদের কার্যবিবরণীও প্রকাশ করলেন। এঁরা হলেন তিন দেশের তিন বিজ্ঞানী—হল্যানডের হিউগো ডি ভ্রাইস (Hugo De Vries), জারমানির কারল কোরেন্স (Karl Correns) এবং অষ্ট্রিয়ার এরিখ শ্চেরম্যাক (Erich Tschermark)। ভ্রাইস তাঁর গবেষণাপত্র পাঠ করেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মারচ জারমান বোটানিক্যাল সোসাইটিতে, কোরেন্স আসেন ঠিক এক মাস পরে ২৪ এপ্রিল সেই একই সোসাইটিতে এবং শ্চেরম্যাকও এলেন সেখানেই, আরও দুমাস পরে, জুন মাসের ওই তারিখে।

এইভাবে মেনডেল স্বীকৃত হলেন এবং সেই সঙ্গে উদ্ভাসিতও হলেন। জীববিদ্যার জগতে যুগান্তর এল। নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল।

মেনডেলের মতবাদের (Mendelism) পুনরাবিষ্কারের পূর্বে, বংশানুসৃতি প্রধানত সংমিশ্রণ হিসেবে গ্রহণ করা হত—দুটি একই ধরণের বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ, যে বৈশিষ্ট্য পিতামাতা বহন করে চলেছে। বক্তব্য কি ঠিক? ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এক স্কটদেশীয় এনজিনিয়ার এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, যদি এ কথা সত্য হয় তাহলে ডারউইনের থিওরি অব ইভোলিউলসনের (Theory of evolution) ক্ষেত্রে পুরাতনের সঙ্গে ধারাবাহিক সংমিশ্রণে নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি অবলুপ্ত হবে।

৪ আউনস রঙ্গীন জলের সঙ্গে ৪ আউনস কলের জল মেশালে কী হবে? রঙ্গীন জল একটু হালকা হবে। এই হালকা রঙ্গীন জল থেকে ৪ আউনস নিয়ে আবার যদি তা ৪ আউনস কলের জলের সঙ্গে মেশানো হয়? পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি চলুক দশবার। তাহলে দশম মিশ্রণের পরে দেখা যাবে যে ৪ আউনস জলের মধ্যে মাত্র ১/১০২৪ রঙ্গীন হয়ে আছে, যা দেখতে প্রায় কলের জলেরই মতন।

এরপরে এলেন মেনডেল। মেনডেলের গবেষণা থেকেও প্রমাণিত

9725

হল যে, বংশবৈশিষ্ট্য সংমিশ্রণজনিত নয়। কিন্তু মেনডেল কি তাঁর গবেষণায় সংগৃহীত তথ্য থেকে এ কথা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন? আমরা জানি মেনডেল ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিজ' (Origin of species) পড়েছিলেন। কারণ তাঁর মঠে অরিজিন অফ স্পিসিজ-এর এক খণ্ড পাওয়া যায়। এর বিভিন্ন পৃষ্ঠায় মেনডেলের হস্তাক্ষরে টীকা-টিপ্পনী লক্ষ্য করা গেছে। এ কথা একদমই মনে হয় না যে, এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেনডেলের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

কিন্তু তিনি তাঁর গবেষণাপত্রে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেননি কেন? এক হতে পারে, গবেষণাপত্র প্রকাশিত হবার পরে এদিকে তাঁব দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, আবার এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, ডারউইনের বক্তব্য তৎকালীন ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে বলে তিনি কোনো অভিমত ব্যক্ত করেন নি।

মেনডেলের বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পরে ভিত্তি সুদৃঢ় হলে পরবর্তী কার্যক্রম সহজতর এবং দ্রুততর হয়ে এল। মেনডেল কথিত বিশেষত্বগুলির বংশাণু এবং অনুবীক্ষণে দেখা ক্রোমোজোমের মধ্যে জীব-বিজ্ঞানীরা সম্পর্ক লক্ষ্য করলেন। এই সম্পর্কের দিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিশিষ্ট কোষবিদ্যাবিশারদ্ ডবলিউ এস সাটন (W. S. Sutton)। তিনি বললেন, বংশাণু যেমন জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন হয় এবং একটি আসে পিতার ও অন্যটি মাতার জননকোষ থেকে, ক্রোমোজোমও সে রকম। সেগুলিও অনুরূপভাবে জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন হয়। কিন্তু কোনো জীবের বংশানুসৃত বিশেষত্বের সংখ্যা অনেক। অথচ ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। মানুষের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম ২৩ জোড়া। সেইজন্যে ক্রোমোজোমের সঙ্গে বংশাণুর সাদৃশ্য স্থাপনে অসুবিধা দেখা দিল। জীববিদ্যাবিদেরা তখন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, ক্রোমোজোমগুলি বংশাণু নয়। এক একটি ক্রোমোজোম বহু বংশাণুর সমষ্টি।

এখন বংশাণুর পর্যালোচনা করার জন্যে একটি আদর্শ উপাদানের প্রয়োজন। মটর উদ্ভিদ্ অপেক্ষা একটি উন্নততর ব্যবহারোপযোগী উপাদানের অনুসন্ধান করছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-বিদ্যাবিদ্ টমাস হানট মরগ্যান (Thomas Hunt Morgan)। তিনি জেনেটিকস সংক্রান্ত গবেষণায় ফলের মক্ষিকা (Drosophila melanogastar) ব্যবহারের কথা চিন্তা করে দেখলেন।

গবেষণার ক্ষেত্রে ফলের মক্ষিকা যে মটর উদ্ভিদ্ অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী সন্দেহ নেই। স্বল্প সময়ে এগুলির জনন হয় প্রচুর সংখ্যায়। পরিমিত খাদ্য প্রয়োগেই এদের বিপুল উৎপাদন সম্ভব। তা ছাড়া এদের বংশানুসৃত বিশেষত্ব কম নয় এবং তা সহজেই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। সর্বোপরি ক্রোমোজোমের বিন্যাস তুলনামূলকভাবে সরল; ফলের মক্ষিকায় প্রতিটি কোষে যেখানে মাত্র চার জোড়া ক্রোমোজোম থাকে, মেনডেলের মটর উদ্ভিদে সেখানে সাত জোড়া, ইঁদুরে দশ জোড়া এবং মানুষের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের সংখ্যা তেইশ জোড়া।

ক্রোমোজোমে অবস্থিত বংশাণুরা সব সময়ে পরস্পর নিরপেক্ষ-ভাবে বংশানুসৃত হয়, মেনডেলের এই আপাত সত্য ধারনাটি মরগ্যানের গবেষণাগারে প্রমাণিত হল। মেনডেল একদিক দিয়ে অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিলেন। মটর উদ্ভিদের যে সাতটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মেনডেল গবেষণা করেছিলেন, যে সব বংশাণু দ্বারা তারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের অবস্থান ছিল ভিন্ন ক্রোমোজোমে। সম্ভাবনাবাদের দিক থেকে এটি একটি অত্যন্ত আকস্মিক ঘটনা।

মেনডেল যে সাতটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে সঙ্কর-প্রজনন সম্পূর্ণ করেন তার ভিতর সবুজ এবং হলুদ রংয়ের বীজের মধ্যে সঙ্কর-প্রজননের ফল পরবর্তী বংশধারায় (Generation) লক্ষ্য করবার সময়ে তিনি ২৫৮টি উদ্ভিদ্ গ্রহণ করেছিলেন। বীজ সংগ্রহ করেছিলেন ৮০২৩টি। এর মধ্যে ৬০২২টি হলুদ রংয়ের এবং ২০০১টি সবুজ রংয়ের। ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, তিন-চতুর্থাংশ হলুদ এবং এক-

চতুর্থাংশ সবুজ। মসৃণ এবং কুঞ্চিত বীজের বেলাতেও অনুরূপ ফলাফল। এখানে বীজের সংখ্যা ৭৩২৪। এর মধ্যে ৫৪৭৪টি মসৃণ এবং ১৮৫০টি কুঞ্চিত। এখানে সেই একই অনুপাত বজায় আছে। শুধু এই দুটি ক্ষেত্রে নয়, যে সাতটি ভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মেনডেল তাঁর গবেষণা কার্য সম্পাদন করেন তার প্রতিটিতেই একই ফলাফল।

কিন্তু দুটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদের সঙ্কর-প্রজননের বেলায় ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়ায় যেখানে দুটি বৈশিষ্ট্যেরই অবস্থান ভিন্ন ক্রোমোজোমে। প্রজননের ক্ষেত্রে এবারে নেওয়া হল কুঞ্চিত গঠনের এবং হলুদ রংয়ের বীজ ও সবুজ এবং মসৃণ গঠনের বীজ। মেনডেল ১৬টি উদ্ভিদ্ থেকে বীজ সংগ্রহ করেছিলেন ৫৫৬টি। এর মধ্যে ৩১৫টি মসৃণ এবং হলুদ বীজ, ১০১টি কুঞ্চিত এবং হলুদ, ১০৮ টি মসৃণ এবং সবুজ বীজ ও ৩২টি কুঞ্চিত এবং সবুজ বীজ। এখন আর অনুপাত ৩:১ নয়, এ ক্ষেত্রে অনুপাত দেখা যায় ৯:৩:৩:১ হিসেবে।

মসৃণ এবং কুঞ্চিতের মধ্যে মসৃণ প্রকট ও হলুদ এবং সবুজের মধ্যে হলুদ প্রকট ধরে এই যে হলুদ-মসৃণ, হলুদ-কুঞ্চিত, সবুজ-মসৃণ, সবুজ-কুঞ্চিতের ৯:৩:৩:১ অনুপাত, কি ভাবে এই অনুপাতে উদ্ভিদ্গুলি উৎপাদিত হল?

মেনডেল একটি অমিশ্রিত হলুদ রংয়ের ও মসৃণ গঠনের বীজ সমন্বিত উদ্ভিদের সঙ্গে একটি অমিশ্রিত সবুজ রংয়ের ও কুঞ্চিত গঠনের বীজসমন্বিত উদ্ভিদের সঙ্কর-প্রজনন ঘটান P_1 পর্যায়ে। এর ফলে F_1 পর্যায়ে যে উদ্ভিদ্গুলি সৃষ্টি হল, সেগুলি সবই হলুদ ও মসৃণ এবং মসৃণ বীজ উৎপাদনক্ষম, কারণ হলুদ ও মসৃণ হল প্রকট বৈশিষ্ট্য। এখন F_1 পর্যায়ে দুটি উদ্ভিদের স্বনিষেকে F_2 পর্যায়ের ওই নির্দিষ্ট অনুপাতের উদ্ভিদ্গুলি সৃষ্টি হল।

ধরা যাক, হলুদ রং নির্ণয়ের বংশাণু ইংরেজী বর্ণমালার বড় অক্ষরের A, সবুজ রং নির্ণায়ক বংশাণু B, মসৃণ গঠনের বংশাণু C এবং কুঞ্চিত গঠনের বংশাণু D দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।

তাহলে অমিশ্রিত হলুদ-মসৃণ AACC প্রকৃতির, যেখানে সবুজ-কুঞ্চিত BB-DD প্রকৃতির। F_1 পর্যায়ে এদের মিশ্রণ ঘটানো হল। এখন F_1 পর্যায় লক্ষ্য করা যাক। F_1 পর্যায়ে যে উদ্ভিদ্গুলি উৎপন্ন হল, সেগুলি হলুদ রংয়ের এবং মসৃণ গঠনের ও ABCD প্রকৃতির। এখন ABCD প্রকৃতির উদ্ভিদ্গুলির স্বনিষেকে F_2 পর্যায়ের সৃষ্টি হল :

ABCD

ABCD	AC	BD	AD	BC
AC	হলুদ-মসৃণ	হলুদ-মসৃণ	হলুদ-মসৃণ	হলুদ-মসৃণ
BD	হলুদ-মসৃণ	সবুজ-কুঞ্চিত	হলুদ-কুঞ্চিত	সবুজ-মসৃণ
AD	হলুদ-মসৃণ	হলুদ-কুঞ্চিত	হলুদ-কুঞ্চিত	হলুদ-মসৃণ
BC	হলুদ-মসৃণ	সবুজ-মসৃণ	হলুদ-মসৃণ	সবুজ-মসৃণ

চিত্রটি লক্ষ্য করলে নির্দিষ্ট অনুপাতের কারণ বোঝা যায়।

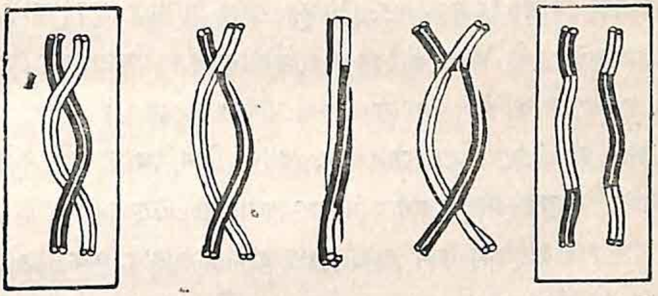
এই অনুপাত লক্ষ্য করা যায় যখন দুটি বৈশিষ্ট্যেরই অবস্থান ভিন্ন ক্রোমোজোমে। কিন্তু দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী দুটি ভিন্ন বংশাণুর অবস্থান একই ক্রোমোজোমে সন্নিবেশিত হলে? মরগ্যান মেনডেলের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সত্যতাকে স্বীকার করে তাকে আরও বিস্তৃত করে বললেন যে, দুটি ভিন্ন বিশেষত্ব নিয়ন্ত্রণকারী দুটি ভিন্ন বংশাণুর অবস্থান একই ক্রোমোজোমে হলে তাদের বংশানুসৃতি একত্রেই হয়। একই গাড়ীতে দুজন যাত্রীর কথা চিন্তা করা যাক। এদের একজন সামনের আসনে, অন্যজন পিছনের আসনে বসেও যেমন একত্রে যাত্রা করতে পারেন, ঠিক তেমনই।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা থেকেও সে সত্য স্বীকৃত হল। গবেষকদ্বয় বেটসন (W. Bateson) এবং পানেট (R. C. Punnet)। দু ধরণের সুইট পী নিয়ে এঁরা গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন। একটিতে বেগনী ফুল এবং দীর্ঘ পরাগরেণু, অন্যটিতে লাল ফুল এবং গোলাকার পরাগরেণু। মেনডেলের মটর উদ্ভিদ্ নিয়ে গবেষণার বেলায় যা ঘটেছিল সে রকম এই চারটি বৈশিষ্ট্য যদি নিরপেক্ষভাবে বংশানুসৃত হত, পরবর্তী প্রজন্মে তাহলে পূর্বের মত

চার ধরণের উদ্ভিদ্ সেই ৯:৩ : ৩:১ অনুপাতেই লক্ষ্য করা যেত। গৃহীত পরীক্ষায় উদ্ভিদের সংখ্যা ছিল ২৫৬। যদি ৯:৩ : ৩:১ এই অনুপাত অনুসৃত হত, তা হলে বেগনী এবং দীর্ঘ পরাগরেণুবিশিষ্ট উদ্ভিদের সংখ্যা ১৪৪, বেগনী এবং গোলাকার রেণুবিশিষ্ট উদ্ভিদের সংখ্যা ৪৮, লাল এবং দীর্ঘ পরাগরেণুবিশিষ্ট উদ্ভিদ্ ৪৮ ও লাল এবং গোলাকার পরাগরেণুযুক্ত উদ্ভিদের সংখ্যা ১৬ হিসেবে বাস্তবে লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা লক্ষ্য করা গেল, পর্যায়ক্রমে তা হল ১৭৭, ১৫, ১৫, এবং ৪৯। তবে যদি বেগনীর সর্বমোট বর্ণের সঙ্গে লালের অনুপাত নেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু লাল এবং বেগনীর অনুপাত ৩:১ হিসেবেই লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ এবং গোলাকৃতি পরাগরেণুর ক্ষেত্রেও একই ফলাফল। কিন্তু সঙ্কর মটর উদ্ভিদের F_2 পর্যায়ের যে ফলাফল তা এখানে দেখা গেল না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিরপেক্ষভাবে বংশানুসৃত হয়নি। বস্তুত বেগনীর সঙ্গে দীর্ঘ পরাগরেণু এবং লালের সঙ্গে গোলাকার পরাগরেণুর সহ-অবস্থান ঘটেছে।

মরগ্যানের গবেষণাগারেও অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল। সঙ্গে ছাত্রেরা এবং সহযোগীরা। সকলের প্রচেষ্টায় মক্ষিকার উৎপাদন হল অসীম সংখ্যায়। গবেষণার উপযুক্ত মক্ষিকা পাওয়া গেল। ধূসর বর্ণ এবং দীর্ঘ পক্ষবিশিষ্ট ও কালো এবং খর্ব পক্ষবিশিষ্ট। এদের মিলনে দু ধরনের সন্ততি পাওয়া গেল। (ক) ধূসরবর্ণ এবং দীর্ঘ পক্ষবিশিষ্ট মক্ষিকা (খ) কৃষ্ণবর্ণ এবং খর্ব পক্ষবিশিষ্ট মক্ষিকা। এখানে যদিও ধূসরবর্ণের সঙ্গে দীর্ঘপক্ষের এবং কৃষ্ণবর্ণের সঙ্গে খর্বপক্ষের মিলন হল, কিন্তু বেটসন এবং পানেটের অভিজ্ঞতার মত দ্বি-সঙ্কর জননের সেই বিশেষ অনুপাতটি পাওয়া গেল না। তাছাড়া ধূসরবর্ণের এবং খর্ব পক্ষবিশিষ্ট মক্ষিকাও লক্ষ্য করা গেল। দুটি বিভিন্ন বিশেষত্ব নিয়ন্ত্রণকারী দুটি ভিন্ন বংশাণুর অবস্থান একই ক্রোমোজোমে হলে তাদের বংশানুসৃতি যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একত্রেই হয় — তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মরগ্যানের গবেষণাগারে ফলের মক্ষিকার বহু

বৈশিষ্ট্যের বংশানুসৃতি নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। কিন্তু এই প্রজননগত সংযুক্তি অপরিবর্তনীয় নয়। এক খণ্ড ক্রোমোজোম অন্য কোনো ক্রোমোজোম খণ্ডের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করতে পারে। এ জাতীয় ক্রোমোজোম বিনিময় (Crossing Over) জননকোষ বিভাজনের সময়ে ঘটে। তখন পরস্পর সংযুক্ত বিশেষত্বগুলি বিচ্ছিন্ন হয় এবং নতুন সংযুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে কৃষ্ণবর্ণ এবং খর্ব পক্ষবিশিষ্ট মক্ষিকা ও ধূসরবর্ণ এবং দীর্ঘ পক্ষবিশিষ্ট মক্ষিকার প্রজননে কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ পক্ষবিশিষ্ট মক্ষিকা এবং ধূসরবর্ণ ও খর্ব পক্ষবিশিষ্ট



মক্ষিকা কখনো কখনো পাওয়া যেতে পারে। ক্রোমোজোম বিনিময়ের ফলে উদ্ভব এই নতুন ধরণের মক্ষিকাগুলি পরবর্তী প্রজন্মেও পাওয়ার কথা। অবশ্য আরও একবার ক্রোমোজোম বিনিময় হলে অন্য অবস্থা।

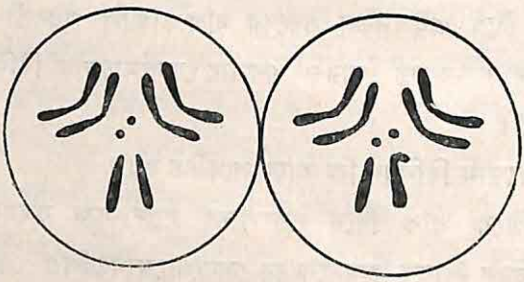
ক্রোমোজোম বিনিময় কি ভাবে সংঘটিত হয়?

দুটি দড়িকে পাক দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করবার সময়ে চেহারাটা যেমন দাঁড়ায় জননকোষে ক্রোমোজোমগুলিও কোনো এক বিশেষ অবস্থায় সেইভাবেই থাকে। যখন ক্রোমোজোম বিচ্ছিন্ন হয় তখন বিনিময় সংঘটিত হয়।

এ সব থেকে নিঃসন্দেহে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। ক্রোমোজোমে বংশাণুগুলির অবস্থান সরল নিয়মে। মরগ্যান এবং অন্যান্য গবেষকেরাও এই গবেষণা থেকে ক্রোমোজোমে নির্দিষ্ট বংশাণুর অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফলের মক্ষিকা নিয়ে মরগ্যানের গবেষণার আর একটা দিক ছিল। যৌন বংশানুস্মৃতির বিষয়ে মরগ্যান এবং তাঁর সহকর্মীরা সর্বপ্রথম আলোকপাত করতে সমর্থ হন। অবলম্বন ওই ফলের মক্ষিকা। পৃথিবীর যে কোনো জীবিত প্রাণীর নির্দিষ্ট প্রজাতিতে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সাধারণভাবে সমানুপাতিক হওয়াই যে স্বাভাবিক ও সঙ্গত, মরগ্যানের গবেষণাগারে তা সর্বপ্রথম প্রমাণিত হয়।

একটি মক্ষিকার কোষ লক্ষ্য করা যাক। স্ত্রী মক্ষিকার ক্ষেত্রে চার জোড়া অনুরূপ ক্রোমোজোমের চারটি জোড় বিদ্যমান। এর মধ্যে এক জোড়া বিন্দুর মত, বিন্দুর চেয়ে সামান্য বৃহদাকৃতি, অন্য দু জোড়া ইংরেজী V আকারের এবং দীর্ঘাকৃতি। আর এক জোড়াও দীর্ঘ, সরলরেখাকৃতি। এবার পুরুষ মক্ষিকার বেলায় আসা যাক। এখানেও চার জোড়া ক্রোমোজোম, প্রথম তিন জোড়া স্ত্রী মক্ষিকার মতনই। চতুর্থ জোড়া অর্থাৎ সরল রেখাকৃতি ক্রোমোজোম জোড়া স্ত্রী মক্ষিকায় যা লক্ষ্য করা যায়, পুরুষ মক্ষিকায় তার একটিতে একটি হুকের আকৃতি নজরে আসে। পুরুষ ও স্ত্রী মক্ষিকার এই তিনটি



সরলরেখাকৃতি ক্রোমোজোম X ক্রোমোজোম হিসেবে নির্দিষ্ট। এবং পুরুষ মক্ষিকার হুকের মত বাঁকানো ক্রোমোজোমটি Y ক্রোমোজোম নামে নির্দিষ্ট। এই চারটি হল যৌন ক্রোমোজোম। পুরুষ মক্ষিকার মধ্যে শুধু Y ক্রোমোজোমটি দেখা গেল বলে আর একটি নতুন চিন্তার উদয় হল। মনে হল লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। পরবর্তীকালে সে অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হল।

মাইক্রোস্কোপের ভিতর দিয়ে এই ক্রোমোজোম লক্ষ্য করবার সময়ে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা ছিল মানুষের কাছে চিরন্তন রহস্য ও কৌতূহলের বিষয়, সেই পুরুষ ও নারীর অনুপাত বিষয়ক সমস্যাটির সমাধান হল।

যখন ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয়, তখন প্রতিটিতে একটি করে X ক্রোমোজোম থাকে। শুক্রকোষ থেকে সৃষ্ট অর্ধেক সংখ্যক শুক্রাণু X ক্রোমোজোমযুক্ত, অন্য অর্ধেক Y ক্রোমোজোমযুক্ত। বাকি অংশ অনুধাবন করা কঠিন নয়। যখন X ক্রোমোজোম সমন্বিত কোনো শুক্রাণু ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়, তখন নিষিক্ত ডিম্বাণু স্বভাবতই স্ত্রী-মক্ষিকার জন্ম দেয়। অপর পক্ষে Y ক্রোমোজোমবিশিষ্ট শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলনের ফলে পুরুষ মক্ষিকার জন্ম হয়। টস করে হেড টেলের ব্যাপারটা যে রকম, এখানে সম্ভাবনার ব্যাপারটা ঠিক সে রকম অর্থাৎ সমান-সমান। সুতরাং যে কোনো জীবিত প্রাণীর নির্দিষ্ট প্রজাতিতে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা মোটামুটি সমানুপাতিক।

এই তো হল লিঙ্গ নির্ণয় করবার প্রক্রিয়া। কিন্তু যে X ও Y ক্রোমোজোমের সাহায্যে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, তারা কি পৃথকভাবে কোনো কোনো সহজাত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে? গবেষণাগারে মরগ্যান স্বাভাবিক লাল চক্ষুবিশিষ্ট মক্ষিকার মধ্য থেকে একটি সাদা চক্ষুবিশিষ্ট মক্ষিকা লক্ষ্য করেন। আর এই হঠাৎ আবিষ্কারই জেনেটিকসের জগতে প্রতিষ্ঠিত করার পথে তাঁকে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করে। সাদা চক্ষুবিশিষ্ট পুং-মক্ষিকাটি স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তির ফলেই সম্ভব হয়েছিল। মরগ্যান উদ্যোগী হলেন। সাদা চক্ষুবিশিষ্ট মক্ষিকাটির সঙ্গে স্বাভাবিক লাল চক্ষুবিশিষ্ট একটি স্ত্রী-মক্ষিকার মিলন ঘটানো হল। এবং পরবর্তী প্রজন্মের সব কটিরই লাল চক্ষু লক্ষ্য করা গেল। এখানে মরগ্যানের পর্যবেক্ষণ মেনডেলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লাল চক্ষু বৈশিষ্ট্যনির্ধারক বংশাণু প্রকট বংশাণু এবং সাদা চক্ষু বৈশিষ্ট্যনির্ধারক বংশাণু প্রচ্ছন্ন বংশাণু। মরগ্যান

গবেষণায় ৪২৫২টি মক্ষিকা গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় প্রজন্মেতে তিনি দেখলেন যে, মোটামুটিভাবে মেনডেলের সূত্রটি অনুসৃত হচ্ছে। লাল চক্ষুর সঙ্গে সাদা চক্ষুর সংখ্যার অনুপাত ৩:১। লাল চক্ষু যেখানে ৩৮৭০ সাদা চক্ষু সেখানে ৭৮২। কিন্তু সাদা চক্ষুর বেলায় যে বৈশিষ্ট্যটি তাঁকে প্রভাবিত করল, তা হল এরা প্রত্যেকেই পুং-মক্ষিকা। মরগ্যান তখন নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি বুঝলেন, যে বংশাণু সাদা চক্ষু নিয়ন্ত্রণ করে তার সঙ্গে লিঙ্গের সম্পর্ক আছে। এই পরীক্ষায় সর্বপ্রথম আর একটি বিষয় প্রমাণিত হল— তা এই যে, বংশাণুর অবস্থান ক্রোমোজোমে। ফলের মক্ষিকার উপরে গবেষণা কার্যের জন্যে মরগ্যান নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।

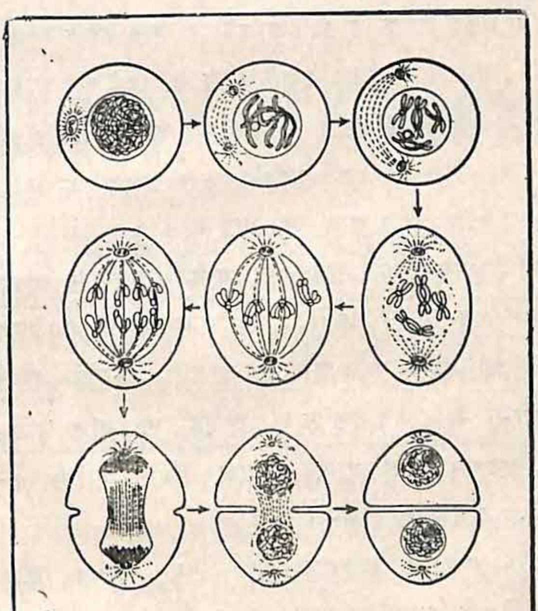
সঙ্কর-প্রজানন সংক্রান্ত গবেষণায় আরও একটি বিষয় সম্পর্কেও বিজ্ঞানীরা অবগত হলেন মেনডেলের পরবর্তী কালে। সঙ্কর-প্রজননের সময়ে একই জাতীয় দুটি বৈশিষ্ট্য কি ভাবে অনুসৃত হয়? মেনডেল ভেবেছিলেন কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রকট এবং প্রচ্ছন্নভাব আংশিকভাবে নয়, সঙ্কর-প্রজননের সময়ে তা সংক্রামিত হয় সম্পূর্ণভাবে। হয় প্রকটভাব, নয় প্রচ্ছন্নভাব, অংশবিশেষ নয়। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। বিজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে জেনেছেন, প্রকট এবং প্রচ্ছন্নভাব সম্পূর্ণ নয়, অনুসৃত হয় বিভিন্ন মাত্রায়। আর এর সঙ্গে আরও একটি সত্য উদ্‌ঘাটিত হল। বহু বৈশিষ্ট্য আছে, যে গুলি একাধিক বংশাণু নির্ভর— আমাদের গাত্রবর্ণ যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সঙ্কর-প্রজনন সম্পর্কে উদ্‌ঘাটিত বিভিন্ন তথ্য জেনেটিকসের জনক মেনডেলের বক্তব্যকে বিশদ করে তুলল। একদিন মটর উদ্ভিদ্ অবলম্বনে যে বিষয়টির অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে তা বিভিন্ন জীবনে পরিব্যপ্ত হল।

চার

যে মানবদেহ অসংখ্য কোষযুক্ত, সূচনা তার একটি মাত্র কোষ থেকে। তারপর কোষ থেকেই সকল কোষের সৃষ্টি, পুনঃ পুনঃ কোষ বিভাজন এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষিত পরিচিত প্রাণীটির উৎপত্তি।

একটি পূর্ণাবয়ব মানুষের দেহে কতগুলি কোষ আছে? সংখ্যায় যা পাই তা হল ১০,০০০,০০০,০০০,০০০। এই যে অতি বৃহৎ কোষসংখ্যা একটি মানুষের সম্পূর্ণ দেহের মধ্যে এর প্রতিটি দেহ-



কোষেই আছে ২৩-জোড়া ক্রোমোজোম। কোষ বিভাজনের সময়ে

একটি কোষ অন্তর্ভুক্ত ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের প্রত্যেকটিই দৈর্ঘ অবলম্বনে দ্বিখণ্ডিত হয়। এই দ্বিখণ্ডিত ক্রোমোজোমগুলিও দুটি অনুরূপ গোষ্ঠীভুক্ত থাকে। তারপর একটি কোষ থেকে যখন দুটি কোষের উৎপত্তি, তখন দ্বিতীয় কোষেও প্রথম কোষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের অবিকল চিত্ররূপটি। এরই পুনরাবৃত্তি চলে সবগুলি কোষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রেই।

এই পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটা সব দিক দিয়েই অত্যন্ত নিখুঁত কিন্তু তবুও যে কখনো কখনো সামান্য ভুল ত্রুটি ঘটে না, এমন কথা জোর করে বলা চলে না। ব্যাপারটাকে কোনো পাকা টাইপিস্টের কপি নকল করার সঙ্গে সহজেই তুলনা করা চলতে পারে। কারবন কপি নয়, একই লেখার অরিজিন্যাল টাইপ— লক্ষ, নিযুত, বা কোটি কপির দরকার নেই, সামান্য বিশ, পঁচিশ বা তিরিশ কপিই উদাহরণ হিসেবে যথেষ্ট।

তুলনাটা যতই সহজ হোক, কাজটাকে তত সহজ বলে মনে করা উচিত নয়। আনাড়ী হাতের একটা মাত্র কপিরই দশ লাইন টাইপেই পাঁচ সাতটা ভুল থাকতে পারে— কিন্তু খুব পাকা হাতের বেশ কয়েক কপি আলাদা টাইপে এক আধটা ভুল থেকে যাওয়া একেবারে অসম্ভব, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

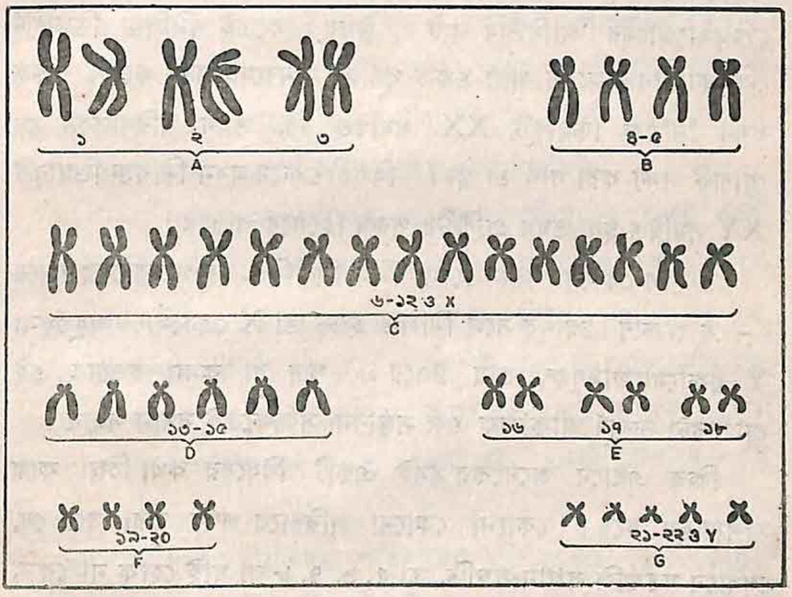
কোষের বেলায় ক্রোমোজোমের যে কপি হচ্ছে তা সামান্য কয়েক কপি নয়, দশ লক্ষ কোটি কপি। এই ক্রোমোজোমের মধ্যে আবার আছে বংশাণু, যা বহন করে জীবনের ভাষা। একটি সম্পূর্ণ মানুষের পরিচয়ের জন্যে জীবনের যত ভাষা আছে তা যদি মুদ্রিত বইয়ের পাতায় পরিবেশন করা যায়, তাহলে প্রমাণ সাইজ ৫০০ পাতার বইয়েরও হাজার খণ্ড প্রয়োজন।

অবস্থাটা একবার অনুমান করে দেখা যাক। জীবদেহে এই ভাষারই অবিকল মুদ্রণ চলেছে কোষ বিভাজন এবং কোষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। একদল পাকা টাইপিষ্ট যেন সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে করে

চলেছেন। কিন্তু কাজ অতি বৃহৎ, ফলে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আসতে পারে কখনো কখনো। ছাপার ভুল যেমন বিষয় ভাবনাকে ব্যাহত করে, তেমনই জীবনের ক্ষেত্রে এই মুদ্রণ-প্রমাদ সাধারণভাবে জীবনের স্বাভাবিকত্বকে ক্ষুন্ন করে।

ব্যাপারটা বোঝানোর জন্যে মানুষের দেহকোষের যৌন ক্রোমোজোম দুটিকে নিয়ে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আগে বলে নিই যৌন ক্রোমোজোমের সাহায্যে কী ভাবে নারী বা পুরুষের সৃষ্টি হয়।

আমরা দেখেছি যে, মানুষের দেহকোষে যৌন ক্রোমোজোম দুটিকে X ও Y দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আকৃতি ও আয়তনে X ও Y



মানবদেহে ক্রোমোজোম

ক্রোমোজোম দুটির মধ্যে পার্থক্যও দেখা যায়। স্ত্রীলোকের দেহকোষে থাকে দুটি X ক্রোমোজোম। কিন্তু পুরুষের দেহকোষে একটি X ও একটি Y ক্রোমোজোম।

দেহকোষে ক্রোমোজোমগুলি স্ত্রী বা পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই জোড়ায় জোড়ায় উপস্থিত থাকে। জননকোষ অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টির

কালে মায়োটিক (Meiotic division) নামক বিভাজনে ক্রোমো-জোম সংখ্যা অর্ধেক হয়, সেজন্য এর আর এক নাম রিডাকসন বিভাজন (Reduction division)। ডিম্বাণু সৃষ্টির কালে প্রতিটি ডিম্বাণু অন্যান্য ক্রোমোজোমের সঙ্গে একটি করে X-ক্রোমোজোম লাভ করে। অপর পক্ষে, পুরুষদের শুক্রাণু সৃষ্টির সময়ে অর্ধেক শুক্রাণু একটি করে Y-ক্রোমোজোম ও অপর অর্ধেক সংখ্যক শুক্রাণু একটি করে X ক্রোমোজোম যুক্ত হয়। একটি ডিম্বাণু X বা Y সমন্বিত যে কোনো একটি শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হতে পারে। ফলে নিষিক্ত ডিম্বাণু-গুলিতে হয় দুটি X (XX) না হয় একটি X এবং একটি Y (XY) ক্রোমোজোমের আবির্ভাব ঘটে। উভয় ক্ষেত্রেই নিষিক্ত ডিম্বাণুটি দেহকোষ বিভাজনের দ্বারা একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ গঠন করে। কিন্তু যখন নিষিক্ত ডিম্বাণুটি XX সমন্বিত হয়, তখন পরিণতিতে যে প্রাণীটি লক্ষ্য করা যায় তা স্ত্রী। বিপরীতক্রমে যখন নিষিক্ত ডিম্বাণুটি XY সমন্বিত হয়, তখন প্রাণীটির পুরুষ হিসেবে পরিচয়।

তাহলে কোনো নবজাতকের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় গর্ভাধানের সময়ে — যে শুক্রাণু ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে তা X ক্রোমোজোমযুক্ত না Y ক্রোমোজোমযুক্ত, তার উপরে। পুত্র বা কন্যা হওয়ার এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং সম্ভাবনা সর্বক্ষেত্রেই সমান সমান।

কিন্তু এখানে অনেকের মনই একটি বিষয়ের কথা চিন্তা করে সংশয়াচ্ছন্ন হবে। কোনো কোনো পরিবারে লক্ষ্য করা যায় যে, সেখানে যতগুলি সন্তান-সন্ততি, তা ৫, ৬, ৭, ৮ বা যাই হোক না কেন, তার সবগুলিই পুত্র বা সবগুলিই কন্যা।

কী ভাবে এ সম্ভব ?

ব্যাপারটা সম্ভাবনার তত্ত্বযুক্ত—মুদ্রানিক্ষেপের দৃষ্টান্ত নিলে সহজেই বোধগম্য হবে। ১, ২, ৩, ৫ পয়সার চারটি মুদ্রা। এদের প্রত্যেকটিকে নিয়েই টস করা যাক বেশ কয়েকবার। দেখা যাবে হেড বা টেল, এই দুটো সম্ভাবনার মধ্যে হেড হচ্ছে প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে, বাকি

অর্ধেক টেল। টসের পরিমাণ যত বাড়বে অনুপাতও তত ত্রুটিমুক্ত হয়ে আসবে। প্রতিটি মুদ্রার বেলাতেই তাই। এখন ১ পয়সা আর ২ পয়সা, এই দুটিকে নিয়ে টসের ফলাফল লক্ষ্য করি অনেকবার টস করে। যতবার টস করব, তার প্রায় সিকি ভাগের বেলায় দু-টোতেই হেড, আর এক সিকি ভাগে দুটোতেই টেল। অর্ধেক সম্পূর্ণ হল। বাকি অর্ধেকের ক্ষেত্রে একটির হেড অপরটির টেল। ৩ আর ৫ পয়সা নিয়েও অনেকবার টস করলে অনুরূপ ফলাফল দেখতে পাওয়া যাবে। দুটি মুদ্রার বদলে তিনটি মুদ্রা নিয়ে যদি টস করি এবং ফলাফল লক্ষ্য করে চলি তাহলে বুঝতে পারব যে, তিনবারই হেড বা তিনবারই টেল হয় সমস্ত টসের $\frac{১}{৪}$ বার। চারটি মুদ্রার বেলায় চারবারই হেড বা চারবারই টেল হয় $\frac{১}{৮}$ ক্ষেত্রে। পাঁচবারই হেড বা পাঁচবারই টেল হবে অনুরূপ পদ্ধতিতে $\frac{১}{১৬}$ ক্ষেত্রে। এইভাবে হেড বা টেলের এবং হেডকে পুত্রের ও টেলকে কন্যার সমার্থক ধরে পুত্র বা কন্যার যে কোনো সম্ভাবনার গণনা করা যায় সহজেই।

এ যুগে অবশ্য অনেক পুত্র-কন্যাযুক্ত পরিবারের সংখ্যা বেশী পাওয়া যাবে না। তবু যে সব পরিবারের ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৫ সে রকম যত পরিবার আছে একবার হিসেব নিলে দেখা যাবে যে, ৩২টি সে রকম পরিবারের মাত্র একটিতেই সবকটি ছেলে, সাধারণ-ভাবে এই হারটি অনুসৃত হয়েছে। সবগুলিই মেয়ে এরকমও দেখা যাবে, ৩২টি পরিবারের মাত্র একটিতেই, মোটামুটিভাবে এই হিসেবে।

যদি ৫টি সন্তান-সন্ততিযুক্ত পরিবারের পরিবর্তে ৬টি পুত্র-কন্যাযুক্ত পরিবারের বেলায় আসা যায়? ৬টি পুত্র-কন্যাযুক্ত কতগুলি পরিবার নিলে একটি পরিবার পাওয়ার সম্ভাবনা যেখানে সকলেই পুত্র বা সকলেই কন্যা?

হিসেব করলে লক্ষ্য করার মত, ৬টি সন্তান-সন্ততি যুক্ত ৬৪টি পরিবারের মাত্র একটিতেই সব কজনই ছেলে বা সব কজনই মেয়ে

হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পুত্রসন্তান বেশী হয়— ফলে ৬টি পুত্র হওয়ার সম্ভাবনা ৬টি কন্যা হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে তুলনা-মূলকভাবে বেশী। কিন্তু পুত্র বা কন্যা হওয়ার সম্ভাবনা সমান সমান হওয়া সত্বেও পুত্র কেন বেশী হয়? এর কারণ বলা কঠিন। তবে এমন হতে পারে যে, Y ক্রোমোজোমযুক্ত শুক্রাণুর সন্তরণপটুত্ব অধিক এবং X ক্রোমোজোমযুক্ত শুক্রাণুর পূর্বেই এ ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়।

লিঙ্গ নির্ধারণে যদি কখনো যৌন ক্রোমোজোম ভিন্ন সমবায়ে মিলিত হয়? প্রতিটি ডিম্বাণু একটি X ক্রোমোজোমযুক্ত কিন্তু যদি কোনো অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনে একটি ডিম্বাণু দুটি X ক্রোমো-জোম যুক্ত হয়, তাহলে Y ক্রোমোজোমযুক্ত একটি শুক্রাণুর সঙ্গে মিলনের ফলে পুরুষ-লিঙ্গ নির্ধারক XY বা স্ত্রীলিঙ্গ নির্ধারক XX ক্রোমোজোমের পরিবর্তে সেখানে ক্রোমোজোমের বিন্যাস XXY হিসেবে লক্ষ্য করা যাবে। তখন যে মানবসন্তানটি জন্ম নেবে সে হবে পুরুষ কিন্তু নারীসুলভ আচরণযুক্ত। তা ছাড়া তার মানসিক বিকাশও পূর্ণতা পাওয়ার কথা নয় এবং তার প্রজনন ক্ষমতাও থাকবে না।

যদি Y ক্রোমোজোমযুক্ত কোনো শুক্রাণুর পরিবর্তে X ক্রোমো-জোমযুক্ত শুক্রাণু ওই ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিষিক্ত ডিম্বের সৃষ্টি করে তখন যৌন ক্রোমোজোমের বিন্যাস XXX। বোধহয় এই জাতীয় সমবায়ের জীবনধারণের ক্ষমতা নেই। জীবনধারণের উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত আরও অনেক সমবায়ের কথা বলা চলতে পারে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে পুরুষ জাতকের ক্রোমোজোম গঠনবৈশিষ্ট্যে XY এবং স্ত্রী জাতকের XX হলে কী হবে X ও Y ক্রোমোজোমের বংশাণুর দ্বারাই জাতক জাতিকার যৌনত্ব মুখ্যত নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

জীবন গড়ায় টাইপিস্টের নিখুঁত টাইপের ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে টাইপের যে আকস্মিক ভুল হয়, যার জন্যে বংশাণুর পরিবর্তন,

অধিকতর উন্নত গবেষণার জন্যে বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরির মধ্যেই সেই পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করলেন। বংশাণুতে যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়, তা অনেক সময়ে ক্ষতিকারক। কিন্তু ক্ষতিকারক নয়, বরঞ্চ অনুকূল এমন পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায় কখনো কখনো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। অথচ এখনও সে সব প্রাণীর অস্তিত্ব আছে, বংশাণুর ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবর্তনই যার জন্য দায়ী। বংশাণুর বৈচিত্র্য ব্যক্তির কার্যক্রমেও অনেক সময়ে পরিবর্তন নিয়ে আসে। ফলে বংশধারার অন্যান্য পর্যায়ে, দেহগত, মানসিক এবং ভাবগত ক্ষেত্রে কোনো কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা চলতে পারে।

মানুষের প্রচেষ্টায় বাহ্য যতগুলি কারণের জন্যে বংশাণুর পরিবর্তন ঘটে, তার একটি হল বিকিরণ বা রেডিয়েশন। মারাত্মক বিকিরণ দেহকোষে অনেক সময়ে বংশাণুর পরিবর্তন সৃষ্টি করে। এ পরিবর্তন স্থায়ী পরিবর্তন। চিকিৎসাক্ষেত্রে রঞ্জনরশ্মি (X-Ray), এ ছাড়া গবেষণায়, শিল্পে এবং বাণিজ্যে তার প্রয়োগও বংশাণুর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ, পারমাণবিক বিস্ফোরণও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আণবিক শক্তি সংস্থাগুলি থেকে পরিত্যক্ত পদার্থের অস্বাস্থ্যকর নির্গমনও আছে। এ ছাড়া আছে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, খাদ্য এবং ওষুধের মাধ্যমে যা পরিবর্তন আনতে পারে।

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আমাদের অনেকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত X-Ray বিষয়টি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যাক। স্বল্পমাত্রায় X-Ray এর একাধিকবার প্রয়োগ যে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে, ঠিক সেই পরিবর্তনই ঘটতে পারে মিলিত মাত্রার X-Ray প্রয়োগ করে। এর সঙ্গে আর একটি কথা, পরিবর্তনের মাত্রা X-Ray-এর মাত্রার সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে।

X-Ray যে বংশাণুকে পরিবর্তিত করতে পারে, তা যথার্থভাবে বোঝা গেল ১৯২৭ সালে। ইউনিভার্সিটি অব টেকসাসের তৎকালীন অধ্যাপক এইচ জে মুলার (H.J. Muller) এক বলিষ্ঠ ঘোষণা

করলেন। নিঃসন্দেহে বংশাণুর জগতে পরিবর্তন আনার পরিমণ্ডলে সে ঘোষণা এক দিকচিহ্ন হয়ে রইল। X-Ray বংশাণুতে যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে স্ব-উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে তিনি তা দেখাতে সমর্থ হলেন।

মূলার তাঁর সাফল্যের ক্ষেত্রে Drosophila জাতীয় মাছির উপরে X-Ray প্রয়োগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইঁদুর নিয়ে অনেক গবেষক গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন। ইঁদুর নিয়ে সম্পন্ন বিভিন্ন পরীক্ষায় অনুরূপ একটি পরীক্ষার কথা এখানে বলা যায়।

একটি পুরুষ ইঁদুরের শুক্রাশয়কে কিছুক্ষণ X-Ray এর প্রভাবে রাখা হল। সে প্রভাব পরিমিত, যাতে ইঁদুরটির বাহ্যত কোনো ক্ষতি না হয়। এখন এই ইঁদুরটির সঙ্গে X-Ray এর প্রভাব পড়েনি এমন একটি মেয়ে ইঁদুরের যদি মিলন ঘটানো যায়? তাহলে? তখন উভয়ের মিলনজাত বিভিন্ন বাচ্চার মধ্যে অস্বাভাবিকত্বের সম্ভাবনা থাকে।

পরবর্তী পর্যায়ে এই ইঁদুরগুলি নিয়েও বংশধারার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা চলতে পারে।

কিন্তু ভৌত বা রাসায়নিক বিভিন্ন প্রভাব ছাড়া জীবনকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বংশাণুর উপরে পরিবেশেরও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। আমাদের অনেকের ধারণা, কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বংশাণু যেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্য কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। উভয়ের মিলিত শক্তিতে একটি সম্পূর্ণ মানুষ এবং সেই মানুষটির সকল বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

আমরা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ঋতুচক্রের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠি। একটি সুনির্দিষ্ট আবহমণ্ডলের মধ্যেই আমরা দাঁড়িয়ে থাকি না। পরিবেশ শুধু ঋতুচক্র নয়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বহু বিচিত্র পরিবেশ এবং তাদের আসা যাওয়া। তাই প্রত্যেকটি মানুষের

বেলাতেই পরিবেশের বিভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু সেই বিভিন্নতার মধ্যে আমাদের স্বরূপটির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে।

মাতা-পিতার বংশগত পরিচয় এবং স্বাভাবিক বংশাণুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যনির্ধারক বংশাণুই একটি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে— এমন চিন্তার অনুবর্তী না হয়ে পরিবেশ সম্পর্কে সকলের সচেতনতা প্রয়োজন। বংশাণু তো বটেই সেই সঙ্গে পরিবেশও যথেষ্ট পরিমাণে ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যের ইঙ্গিত বহন করছে। যেমন ভাল জাতের বীজ হলেই তা থেকে ভাল ফল পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তার জন্য প্রয়োজন সেই বীজকে উপযুক্ত পরিবেশে বপন করা এবং উপযুক্ত পুষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

পাঁচ

প্রজনন বিদ্যার জগতে ধারাবাহিক উন্নতি ঘটে চলল।

মূলার রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরিব্যক্তির হার বাড়ানোর উপায় আবিষ্কার করেন। নিঃসন্দেহে তা পরিবর্তনের বংশগতি পর্যালোচনা সহজ করে। কিন্তু মানব প্রজাতির ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে তা কিছু অস্বস্তিকর আশঙ্কার কারণ ঘটায়। এ কথা ঠিক যে পরিব্যক্তি সময়ে সময়ে উন্নততর প্রজাতি সৃষ্টি করে, সৃষ্টির অগ্রগতিতে যা অপরিহার্য। কিন্তু মঙ্গলময় পরিব্যক্তি ব্যতিক্রম মাত্র। যদি একশোটি পরিব্যক্তি গ্রহণ করা যায় তা হলে দেখা যাবে ৯৯টি পরিব্যক্তিই ক্ষতিকারক। এদের মধ্যে কয়েকটি মারাত্মক ক্ষতিকারক হিসেবে গণ্য করা চলতে পারে। অবশ্য মারাত্মক ক্ষতিকারক পরিব্যক্তি কালক্রমে বিনষ্ট হয়। এদের সন্তান উৎপাদন সংখ্যাও অধিক নয় এবং জীবন-যাত্রাকেও স্বাভাবিক বলা চলে না, কিন্তু প্রজাতি কয়েকটি বংশ-পরম্পরায় পরিব্যক্তি পীড়িত প্রাণীর দায়ভার বহন করে চলে।

মূলার পরিব্যক্তির হার বৃদ্ধি করেছিলেন রঞ্জনরশ্মিকে অবলম্বন করে। বিকিরণের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পরিব্যক্তির হার বৃদ্ধির আশঙ্কাও বাড়িয়ে তোলে। বর্তমানে আমরা যত ধরণের বিকিরণের সম্মুখীন, কয়েক দশক পূর্বে তা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। সৌর বিকিরণ, মহাজাগতিক রশ্মি ছাড়াও বর্তমান চিকিৎসা-শাস্ত্রে যথেচ্ছ বিকিরণ প্রয়োগ করা হচ্ছে। তা ছাড়াও বিকিরণ প্রয়োগের অন্যান্য দিক আছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ-ও আছে। নিঃসন্দেহে এ সবই পারিপার্শ্বিকের তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি করছে।

অবশ্য তেজস্ক্রিয়তা রোধের কথা আসে না। মানব কল্যাণে এবং সামাজিক উন্নতি বিধানে বিকিরণের যতটুকু প্রয়োজন, যতটা প্রয়োগ আবশ্যক, ততটুকু গ্রহণ করতে হবে। তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হোক এমন নয়। কিন্তু বিকিরণ সম্পর্কে সচেতনতা দরকার এবং তার প্রয়োগ স্বল্পতম হওয়া উচিত। একটি মানবজীবন সমগ্র জীবনে যতটুকু রঞ্জনরশ্মির সম্মুখীন হয় তা যেন একটি যুক্তিসঙ্গত সীমা অতিক্রম করে বিপদের আশঙ্কা না বাড়িয়ে তোলে সেটুকু লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

বিকিরণ পরিব্যক্তির আশঙ্কা বৃদ্ধি করে— মূলারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তা প্রমাণ করে। কিন্তু মক্ষিকা, উদ্ভিদ্ এবং অন্যান্য প্রাণীর উপরে পরীক্ষার ধারা মানবজীবনের ক্ষেত্রে কতটা প্রযুক্ত হবে? সুপ্রজননবিদরা এ বিষয়ে সংশয়ান্বিত ছিলেন। মানুষ উদ্ভিদ্ নয়, ফলের মক্ষিকা নয়। ফলের মক্ষিকা এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে মেণ্ডেলীয় নিয়ম বংশানুসৃত হয়, মানবজীবনে কতটা তা সঠিক বলে নির্ধারিত হবে? মানুষের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন যে, মানব প্রজনন বিদ্যাও একই নিয়ম অনুসরণ করে চলে। রক্তশ্রেণীর বংশগতিকে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পরিজ্ঞাত উদাহরণ হিসেবে নির্দিষ্ট করা চলতে পারে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ। কারল ল্যাণ্ডস্টিনার (K. Landsteiner) নামে একজন অষ্ট্রিয়ার রোগবিদ্যাবিদ্ মানবরক্তের চার রকম শ্রেণী বিভাগ করতে সক্ষম হন। ইংরাজী বর্ণাক্ষরে সেগুলি নির্দিষ্ট রইল A, B, AB এবং O হিসেবে। যে কোনো ব্যক্তির রক্তই এই চারটি শ্রেণীর একটি শ্রেণীবিশিষ্ট। রক্তসঞ্চালনের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণীবিশিষ্ট রক্ত এক দেহ থেকে সেই শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট অন্য দেহে নিরাপদে সঞ্চালন সম্ভব। রক্তের চারটি শ্রেণীর যে কোনো শ্রেণীর ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য। তা ছাড়াও O শ্রেণীর রক্ত অন্য যে কোনো তিন শ্রেণীর রক্তে নিরাপদে সঞ্চালিত করা চলে। ভিন্ন সঞ্চালন আরও সম্ভব। AB

শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট রোগীর দেহে A এবং B এই দুই শ্রেণীর রক্ত দেওয়া যায়। কিন্তু বিপরীতক্রমে নয়। অর্থাৎ AB শ্রেণীর রক্ত, A অথবা B শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে সঞ্চালিত করলে লোহিতকোষের জমাট বাঁধার আশঙ্কা থেকে যায়। সেই কারণে A ও B শ্রেণীর রক্ত মিশ্রণও আশঙ্কাজনক। O শ্রেণীর রক্ত অন্য যে কোনো তিনটি শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে নিরাপদে সঞ্চালন করলেও O শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে অন্য কোনো শ্রেণীর রক্ত সঞ্চালিত করলে লোহিতকোষের জমাট বাঁধার আশঙ্কা থাকে। ফলে দেহযন্ত্রে রক্ত সংবহন বন্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভব।

ল্যাণ্ডস্টিনার তাঁর আবিষ্কারের জন্যে ভেষজতত্ত্বে ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৩০ সালে।

ল্যাণ্ডস্টিনারের আবিষ্কৃত রক্তশ্রেণীসমূহ আরও বিশ্লেষিত হয়। কিন্তু একথা ঠিক যে, রক্তশ্রেণীসমূহের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে মেনডেলীয় নিয়মে বংশানুসৃতি ঘটে থাকে। ধরা যাক, মাতা ও পিতা উভয়ের রক্তই O শ্রেণীবিশিষ্ট। নিঃসন্দেহে সন্তান-সন্ততিদের সকলেরই রক্ত হবে O শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যদি মাতা বা পিতার একজনের রক্ত হয় A শ্রেণীর এবং অন্যজনের রক্ত O শ্রেণীর, তখন পুত্রকন্যার রক্ত A শ্রেণীবিশিষ্ট। A শ্রেণীর বংশাণু O শ্রেণীর তুলনায় প্রকট বলেই পুত্রকন্যার রক্ত A শ্রেণীবিশিষ্ট। B শ্রেণী এবং O শ্রেণীর মিশ্রণের ক্ষেত্রেও B শ্রেণীর বংশাণু প্রকট বলেই সন্তান-সন্ততি B শ্রেণীযুক্ত। রক্তের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে A অ্যালিল (Alleles) এবং B অ্যালিলের মিশ্রণের সময়ে প্রকট হিসাবে কোনটি লক্ষ্য করা যাবে? না, কোনোটিই নয়। A অ্যালিল এবং B অ্যালিল পরস্পরের তুলনায় কোনোটিই প্রকট নয়। ফলে কোনো ব্যক্তি যদি এই উভয় শ্রেণীর অ্যালিলবিশিষ্ট হয়, তবে তার রক্তের শ্রেণী AB। অনুসৃত রক্তের শ্রেণীবিভাগে মেনডেলীয় নিয়ম এমন সুষ্ঠু এবং সুনির্দিষ্টভাবে হয় যে, পিতৃত্ব অথবা মাতৃত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটিকে অবলম্বন করা চলতে

পারে। যদি O শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট মায়ের A শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট সন্তান হয়, তবে সন্তানের পিতা নিশ্চয় A শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট। অন্যথা এ সম্ভব নয়। O শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট মায়ের B শ্রেণীর রক্তবিশিষ্ট সন্তান হলে পিতার রক্তও B শ্রেণীবিশিষ্ট হবে। মনুষ্যসমাজে শুধু রক্তশ্রেণীর ক্ষেত্রেই যে মেনডেলীয় নিয়ম অনুসৃত হয়, তা নয়, লিঙ্গ নির্ধারক বংশাণুগুলির অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও মেনডেলীয় নিয়মের সত্যতা প্রমাণিত হয়। বর্ণান্ধতা এবং হিমোফিলিয়া রোগে একমাত্র পুরুষদেরই আক্রান্ত হতে দেখা গেছে।

মানব জেনেটিক্স মেনডেলীয় নিয়ম অনুসরণ করায় তার আলোচনা সহজ হল, কিন্তু ফলের মক্ষিকার সরল রীতিনীতির সঙ্গে তার জটিলতার কোনো তুলনাই চলে না। সুতরাং ফলের মক্ষিকার যে সহজ বিশ্লেষণ করা চলে মানুষের জেনেটিক্সের ক্ষেত্রে তা আদৌ সম্ভব নয়। ফলের মক্ষিকার প্রজনন হয় স্বল্প সময়ে, বহু সংখ্যক। মনুষ্য প্রজননের ক্ষেত্রে তা ভিন্নতর। তা ছাড়া মক্ষিকার প্রজনন যেমন গবেষণাগারে করা সম্ভব, মনুষ্য প্রজনন সেরকম সম্ভব নয়। ক্রোমোজোম সংখ্যারও পার্থক্য আছে। মক্ষিকার তুলনায় মনুষ্যের ক্রোমোজোম সংখ্যা অনেক বেশী। বংশগত বৈশিষ্ট্যেও উভয়ের মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। তা ছাড়া মানুষের বহু বৈশিষ্ট্য একাধিক বংশাণুর জটিল, সমষ্টিগত এবং পারিপার্শ্বিকের ফল। সেই কারণে ফলের মক্ষিকার প্রজননগত যে স্বচ্ছ চিত্ররূপটি পাওয়া সম্ভব, মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়।

যাই হোক, বংশগত বৈশিষ্ট্যনিয়ন্ত্রণকারী যে বংশাণু তা কি ভাবে কাজ করে? প্রশ্নটি দুরূহ। ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে একটি অতি সরল জীবের প্রয়োজন। বংশবৈশিষ্ট্য কিভাবে অনুসৃত হয়, তা লক্ষ্য করবার জন্যে ফলের মক্ষিকা ছিল একটি আদর্শ অবলম্বন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফলের মক্ষিকাও এক জটিল জীব। অনুসন্ধানের ফলে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জরজ ডবলিউ বিড্‌ল্ (G. W. Beadle) এবং

এডওয়ারড এল ট্যাটাম (E. L. Tatum) এক সরল জীব গ্রহণ করেন। পর্যালোচনা এবং গবেষণার উপযুক্ত এই জীবটি গোলাপী রঙের সাধারণ পাঁউরুটিজাত ছত্রাক। বৈজ্ঞানিক নাম, নিউরোস্পোরা ক্রাসা (Neurospora Crassa)।

বিড্লের উদ্দেশ্য ছিল, এক একটি বংশাণুকে বিকল বা বিকৃত করে সেগুলির কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করা। বিষয়টিকে একটি দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশদ করে বলা যাক। কেউ যদি একটি মোটরগাড়ী নির্মাণ কারখানায় বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি কি করবেন? উত্তর: তিনি কারখানার বিভিন্ন বিভাগে গিয়ে নির্মাণ কৌশল প্রত্যক্ষ করবেন। কিন্তু তিনি যদি কারখানার অন্তঃপুরে না যান? শুধু সময়ের কাঁটা ধরে শ্রমিকদের যাতায়াত দেখে তিনি কি কিছু অনুমান করতে পারেন? না, তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তবে অপ্রত্যক্ষ কৌশল আছে। যদি কোনো বিভাগের কোনো কর্মীকে হাত পা বেঁধে অকর্মণ্য করে দেওয়ার ফলে দেখা যায় যে, নির্মিত মোটরগাড়ী রেডিয়েটর গ্রিলযুক্ত নয়, তাহলে সহজেই বোঝা যাবে যে, রেডিয়েটর গ্রিল গাড়ীর একটি স্বতন্ত্র অংশ এবং ওই নির্দিষ্ট কর্মীটি রেডিয়েটর গ্রিল সংযুক্তিকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত। এইভাবে অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কেও জানা যেতে পারে। বিষয়টি দীর্ঘ-সময়সাপেক্ষ, ক্লান্তিকর। কিন্তু যেখানে কারখানার ভিতরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই বা যাওয়ার বিধিনিষেধ আছে, সেখানে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কি উপায় থাকতে পারে? বিভিন্ন বংশাণুর কার্যপ্রণালী নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিড্ল্ এবং ট্যাটাম এই পদ্ধতিটির কথাই চিন্তা করলেন এবং নিউরোস্পোরা ক্রাসাকে এই ধরণের পরীক্ষার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জীব হিসেবে গ্রহণ করেন।

নিউরোস্পোরা সব দিক দিয়েই অনুকূল। আহার্যের ব্যাপারে এর বিশেষ কোনো দাবী নেই। টেষ্টটিউবে অজৈব লবণ, শর্করা এবং বায়োটিন নামে একটি ভিটামিন মিশ্রণযুক্ত পরিপোষক মাধ্যমে এই

নিউরোস্পোরা ছত্রাকটি উৎপন্ন হয়। এই সব সামান্য উপাদান থেকেই নিউরোস্পোরা ক্রাসা জীবনের বিকাশ এবং পুষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভিটামিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপাদন করতে পারে। নিউরোস্পোরা ক্রাসা ছত্রাক প্রয়োজনীয় যে খাদ্য উৎপাদন করে সে খাদ্যপ্রাণ মানুষের বেলাতেও প্রয়োজনীয়। কারণ মানুষ, ছত্রাক এবং অন্যান্য সমস্ত জীবের বেলায় খাদ্য হিসেবে যা প্রয়োজন তা মূলত এক। ছত্রাকের আর একটি অতিরিক্ত সুবিধা আছে। বায়োটিন (Biotin) এই ভিটামিনটি ছাড়া এ প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যই প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু মানুষকে তার ভিটামিনগুলির জন্যে নির্ভর করতে হয় সংগৃহীত খাদ্যের উপরে।

নিউরোস্পোরাকে গ্রহণ করার এই একটি কারণ আছে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণের কথা বলা দরকার। যদি নিউরোস্পোরার দু ধরণের প্রজাতির মধ্যে যৌনমিলন ঘটানো যায়? মনে করা যাক, এই দুই ধরণের প্রজাতির একটি A, অন্যটি B। তাহলে উভয়ের যৌন-মিলন AB জাতীয় কোষের সৃষ্টি করবে। কিন্তু যদি দুই ধরণের প্রজাতির মিলন সম্ভব না হয়, তাহলেও তারা যৌনমিলন ব্যতিরেকে শুধু মাত্র কোষবিভাজনের সাহায্যে অযৌন পদ্ধতিতে পুনঃপুনঃ উৎপা-দনে সক্ষম হবে। এ ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টিগুলি একেবারেই প্রথমটির প্রতিলিপি। অর্থাৎ A প্রজাতির থেকে A-এর সৃষ্টি এবং B থেকে B। এইভাবে গোলাপী রংয়ের সাধারণ পাঁউরুটিজাত ছত্রাকের হাজারে হাজারে সৃষ্টি সম্ভব।

এই সব কারণে নিউরোস্পোরা ক্রাসা নির্বাচিত হল।

এই ছত্রাকটি তার জীবনচক্রের এক বিশেষ পর্যায়ে আটটি স্পোরের জন্ম দেয়। প্রজননমূলক পরিগঠনে এগুলি একেবারে অভিন্ন। প্রত্যেকটি স্পোরে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান এবং তা হল সাত। উচ্চতর জীবে যৌনকোষে যেমন দেখা যায়, ক্রোমোজোমগুলি এককভাবে সঞ্চারিত হয় সেখানে, এখানেও সে রকম। নিউরোস্পোরা

ক্রাসাতেও ক্রোমোজোমগুলি এককভাবে সঞ্চারিত হয়, জোড়ায় জোড়ায় নয়। ফলে যদি কোনো একটি ক্রোমোজোমে পরিবর্তন আসে, সে পরিরর্তনের ফলাফলও লক্ষ্য করা সম্ভব হবে। বিড্‌ল্ ও ট্যাটাম নিউরোস্পোরা ছত্রাকে রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে প্রয়োজন অনুসারে পরিব্যক্তির সূচনা করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন।

বিকিরণের পরে স্পোরগুলিতে পরিব্যক্তির সূচনা হবে— কিন্তু কোন্ ধরণের পরিব্যক্তি? পুষ্টিগত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ পরিব্যক্তির উৎপত্তি হচ্ছে কি না দেখা দরকার। যদি বিকিরণ লাভের পরেও স্পোরগুলি প্রচলিত এবং সাধারণ কৃত্রিম পোষক মাধ্যমে বৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়, তাহলে অন্তত এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, জীবের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ক্ষেত্রে কোনো পরিব্যক্তির উৎপত্তি হয়নি। কিন্তু সাধারণ পোষকরসে যেখানে বৃদ্ধি ব্যাহত হত? সেখানে গাড়ীর কারখানায় অপ্রত্যক্ষ উপায়ে কে কোন্ বিভাগে কাজ করেন যেমন নির্ণয় করা যায় ঠিক সেই উপায়ে পোষকরসের কোন্ খাদ্যবস্তুর অভাবে পুষ্টি ব্যাহত হচ্ছে তা নির্ণয় করা হত। বিড্‌ল্ এবং ট্যাটাম এই পরীক্ষার সময়ে বিভিন্ন টেস্টটিউবে নিউরোস্পোরার সাধারণ কৃত্রিম খাদ্যের সঙ্গে প্রত্যেকটিতে একটি ভিন্ন ভিটামিন যোগ করতেন। দেখা গেল, ভিটামিন B-6 যে টেস্ট-টিউবে যোগ করা হয়েছিল, কেবল সেটিতেই গোলাপী রংয়ের ছত্রাকের উৎপত্তি হল, অন্যগুলিতে নয়। এইভাবে এক একটি খাদ্যবস্তু বাদ দিয়ে তাঁরা পরিব্যক্ত স্পোরে অতিরিক্ত খাদ্যবস্তুটি নির্ধারণ করতে সক্ষম হলেন। অথচ পরিব্যক্তির পূর্বে স্পোরের খাদ্যে এটি অপরিহার্য ছিল না।

চূড়ান্ত সাফল্য যে নিকটবর্তী এই সাফল্য থেকে বিড্‌ল্ এবং ট্যাটাম তা অনুমান করতে পারলেন। একটি দিকের ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, নিউরোস্পোরা ক্রোমোজোমের একটি অংশ— একটি বংশাণুর পরিব্যক্তি ঘটেছে এবং এটি এমন একটি বংশাণু যেটি ভিটামিন B-6 নির্মাণে সহায়তা করে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে ইঙ্গিতেই সব নয়

সুস্পষ্ট প্রমাণ দরকার যে, বংশাণুরা বংশগতির একক, বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

আবার বিড্‌ল্ এবং ট্যাটাম ফিরে এলেন পরিব্যক্ত নিউরোস্পোরায়। তাঁরা এক একটি স্পোরের সঙ্গে সুস্থ প্রকৃতিজাত নিউরোস্পোরা স্পোরের মিলন ঘটালেন। একটি নিষিক্ত কোষের সৃষ্টি হল এবং তা আবার একটি উদ্ভিদে বর্ধিত হল। এবং পরবর্তী কার্যক্রমে এর স্পোরগুলিও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কেন? কারণ পরিব্যক্তিতে কোনো বংশাণুর ধর্ম যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তাহলে আটটি স্পোরের চারটির স্বাভাবিক খাদ্য তালিকাতেই বর্ধিত হওয়া উচিত। বাকি চারটি ধীরে ধীরে নিস্তেজ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। কার্যক্ষেত্রেও তাই দেখা গেল। ভিটামিন B-6 প্রয়োগ করলে সবগুলিই স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হয়। কিন্তু তা না প্রয়োগ করলে চারটি স্পোর স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হয় এবং অন্য চারটি নিস্তেজ হয়ে আসে।

এ থেকে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হল যে, পরিব্যক্তি জীবের রসায়নেরও পরিবর্তন ঘটায়। এবং সমস্ত কার্যপ্রণালীরও পরিবর্তন ঘটে সেই সঙ্গে। তাহলে বংশাণু দেহগত রাসায়নিক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। এবং তা রাসায়নিক দিক দিয়ে কার্যকর।

বস্তুত পদ্ধতিটি মানুষ এবং সমস্ত জীবের বেলাতেই অনুরূপ। বিড্‌ল্ এবং ট্যাটামের গবেষণা থেকে আরও একটি তথ্য জানা গেল। তা এই যে ক্রোমোজোমের একটি অংশ, একটি বংশাণু একটি পরিবর্তনের জন্য দায়ী। অবশ্য মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বহুমুখীও হতে পারে। মনুষ্যসমাজে ভিটামিনের অভাব রোগের অজস্র উপসর্গ নিয়ে আসে।

বিড্‌ল্ এবং ট্যাটামের গবেষণার আর একটি দিক আছে। সেখানে এমন দেখা গেছে যে, পরিব্যক্ত স্পোরের খাদ্যবস্তুতে B-6 ভিটামিন ছাড়াও কখনো কখনো আরজিনিন (Arginine) নামক অ্যামিনো অ্যাসিডেরও প্রয়োজন হত। সুস্থ প্রকৃতিজাত যে সব প্রজাতি

সেগুলির পক্ষে আরজিনিন উৎপাদন এমনিতেই সম্ভব। শর্করা এবং অ্যামোনিয়াঘটিত লবণের সাহায্যে এমনটি হয়। পরে পরিব্যক্তির জন্যে সেগুলির আরজিনিন উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হয়। তখন খাদ্য-বস্তুতে এই বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিডটি যোগ না করলে প্রোটিন উৎপাদন সম্ভব হত না। ফলে পুষ্টি ব্যাহত হত।

এর কারণটি কি? আরজিনিন উৎপাদন করছে যে উৎসেচকটি সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে একটি বংশাণু। পরিব্যক্তিতে এই বংশাণুটি বিপর্যস্ত হচ্ছে। ফলে আরজিনিনের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

আবার এমনও ঘটেছে আরজিনিন উৎপাদনে অক্ষম দুটি প্রজাতির মিলনের ফলে এমন কিছু স্পোরের উৎপত্তি লক্ষ্য করা গেছে আর-জিনিন উৎপাদনে যেগুলি সক্ষম।

আরজিনিন উৎপাদনে দুটি বংশাণুর প্রয়োজন আছে, পরীক্ষাকালে দেখা গেল। ধরা যাক, একটি C অন্যটি D। এই দুটি বংশাণু দুটি উৎসেচক উৎপাদনের জন্যে দায়ী, আরজিনিন উৎপাদনে যারা অপরিহার্য। তাহলে C ও D বংশাণু দুটির যে কোনো একটিতে পরিব্যক্তির ফলে নিউরোস্পোরার অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হবে। এখন দু দল নিউরোস্পোরার উপরে বিকিরণ প্রয়োগ করা হল। অনুকূল ক্ষেত্রে, প্রথম দলে C বংশাণুটি হবে ত্রুটিযুক্ত, বংশাণু D স্বাভাবিক, দ্বিতীয় দলে D বংশাণুটি ত্রুটিযুক্ত, বংশাণু C স্বাভাবিক। তাহলে এই দুই প্রজাতির যৌনমিলনে এমন কিছু স্পোরের সৃষ্টি হবে যেগুলির C এবং D উভয় বংশাণুই স্বাভাবিক। কার্যক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

আরও কিছু কিছু গবেষণালব্ধ ফল লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

সাধারণ খাদ্যবস্তুতে আরজিনিন উৎপাদনে অক্ষম তিনটি বিভিন্ন পরিব্যক্ত ছত্রাকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এই তিনটির একটির শুধুমাত্র আরজিনিন সরবরাহেই পুষ্টি সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয়টির বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল আরজিনিন না হয় সাইট্রুলিন (Citrulline)

নামক একটি যৌগের সরবরাহে। তৃতীয়টির বৃদ্ধি ঘটেছিল আরজিনিন, সাইট্রুলিন না হলে আর একটি একই ধরণের যৌগিক বস্তু অরনিথিনের (Ornithine) প্রয়োগে।

এ থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আরজিনিন উৎপাদনে তিনটি বস্তু তিনটি পর্যায়, উৎসেচক অবলম্বনে যেগুলি কার্যকরী।

প্রথমে, অতি সরল কোনো যৌগিক বস্তু থেকে একটি উৎসেচকের সাহায্যে অরনিথিন উৎপন্ন হয়। অরনিথিন উৎপন্ন হওয়ার পরে একটি উৎসেচক অরনিথিনকে সাইট্রুলিনে পরিবর্তিত করে এবং তৃতীয় একটি উৎসেচক এটিকে আরজিনিনে পরিবর্তিত করে।

এখন যদি নিউরোস্পোরার কোনো প্রজাতির আরজিনিন এবং সাইট্রুলিন উৎপাদনকারী উৎসেচক দুটি থাকে কিন্তু অরনিথিন উৎপাদনকারী উৎসেচকটি না থাকে? তাহলে কেবলমাত্র অরনিথিন সরবরাহেই সেটি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করা চলে অন্য দুটি প্রজাতির ক্ষেত্রেও। সুতরাং যে প্রজাতিতে সাইট্রুলিন না হয় আরজিনিনের প্রয়োগে বৃদ্ধি লাভ সম্ভব, সে প্রজাতির ক্ষেত্রে, যে উৎসেচকটি অরনিথিনকে সাইট্রুলিনে পরিবর্তিত করে, সেটি অনুপস্থিত। অতএব এ ক্ষেত্রে আরজিনিন না হলে যে সাইট্রুলিন সরাসরি আরজিনিনে রূপান্তরিত হতে পারে সেই সাইট্রুলিন সরবরাহ করা প্রয়োজন। এবং যে ক্ষেত্রে আরজিনিন প্রয়োগেই বৃদ্ধিলাভ সম্ভব, সে ক্ষেত্রে যে উৎসেচকটি সাইট্রুলিনকে আরজিনিনে রূপান্তরিত করে তারই অভাব ঘটেছে।

নির্দিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে যে বংশাণুরা কাজ করে থাকে বিড্‌ল্ এবং ট্যাটামের বিভিন্ন গবেষণা থেকে তা প্রমাণিত হয়। বংশাণুর কার্যপদ্ধতি তাঁদের আবিষ্কার থেকেই সর্বপ্রথম উদ্ঘাটিত হল। ফলে মরগ্যান, মূলার, বিড্‌ল্ এবং ট্যাটামের গবেষণা জেনেটিক্‌সের পরিমণ্ডলকে বিস্তৃততর করে তুলল।

ছয়

জীবজগতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন তার আকার প্রকারে এবং রাসায়নিক পরিচয়ে কি রকম, যা মটর উদ্ভিদের হলদে বীজ, ফলের মক্ষিকায় কুঞ্চিত ডানা এবং হলুদ বরণ কন্যার কালো বরণ কেশ নিয়ন্ত্রণ করে ?

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী জিনের বা বংশাণুর রাসায়নিক এবং মূল পরিচয় নিউক্লিয়াস অভ্যন্তরস্থ ডি এন এ—ডিঅকসিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড। কোষের অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট অংশ নিউক্লিয়াস যার কর্মপ্রণালী যে কোনো অতি বৃহৎ এবং সুনিয়ন্ত্রিত একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে তুলনীয়।

জীবদেহের সমস্ত কাজই রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। শ্বাসগ্রহণ থেকে শুরু করে চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা প্রভৃতি সমস্ত কাজেই শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তির উদ্ভব কোষের অভ্যন্তরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়।

একটি এককোষী প্রাণীর দেহের যে কোনো একটি কোষকে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করলে দুটি প্রধান অংশ নজরে আসে। কোষের কেন্দ্রস্থলে গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি যে ঘন এবং সর্ববৃহৎ বস্তুটি দেখা যায় সেটিই নিউক্লিয়াস (Nucleus)। নিউ-ক্লিয়াস বাদে কোষের মধ্যকার তরল পদার্থই সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)। অর্থাৎ বলা চলে যে, কোষ থেকে নিউক্লিয়াস বর্জন করলে বাকি যা থাকে তা হল সাইটোপ্লাজম বা কোষ থেকে সাইটোপ্লাজম বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা হল নিউক্লিয়াস।

বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এবং বিক্রিয়ায় এই নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম পরস্পর নির্ভরশীল।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াসের গঠন প্রণালী সম্পর্কে আমাদের সর্বাধুনিক ও একটি স্পষ্ট ধারণা গঠনে সাহায্য করে।

সাধারণ মাইক্রোস্কোপে সাইটোপ্লাজমকে যেমন একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থের মত মনে হয়, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে সেই সাইটোপ্লাজমই অন্য রূপ ধারণ করে। সেখানে সাইটোপ্লাজমের ভেতরে গোলক ধাঁধার মত অনেকগুলি সরু সরু নালিকা বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত থাকে। এই সমস্ত নালিকায় একটা বিশেষ ধরণের প্রাচীর থাকে। এই নালিকাগুলিকে সমষ্টিগতভাবে এনডোপ্লাজমিক রেটিক্যুলাম (Endoplasmic Reticulum) বলা হয়। কিছু কিছু নালিকার প্রাচীরের বাইরের দিকে অনেক ছোট ছোট গোলাকৃতি বস্তু লক্ষ্য করা যায়—এরা রাইবোজোম (Ribosome) নামে অভিহিত। এই সব বস্তু প্রোটিন এবং রাইবোজোমের আর এন এ দিয়ে তৈরী। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, এই রাইবোজোমের উপরেই প্রোটিন সংশ্লেষণ নির্ভরশীল। এ ছাড়া সাইটোপ্লাজমে বহু সংখ্যক গোল অথবা ডিম্বাকৃতি বস্তু দেখা যায়। এদের মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria) বলা হয়। মাইটোকনড্রিয়ার দুটো প্রাচীর থাকে। ভেতরের প্রাচীর মাঝে মাঝে ভাঁজ হয়ে ভেতরের অংশটাকে কতকগুলি অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে। মাইটোকনড্রিয়াকে Power house of the cell বা কোষের শক্তিভাণ্ডার বলা হয়। কারণ মাইটোকনড্রিয়ার ভেতর থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন হয়—যে শক্তি সমস্ত জীবজগৎ পরিচালনা করে। এ ছাড়াও সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে থাকে সেনট্রিওল্‌স (Centrioles), লাইসোজোম (Lysosome), গলগি বডি (Golgi body) প্রভৃতি।

উদ্ভিদ্‌কোষে সাইটোপ্লাজমে সবুজ কণিকা বা ক্লোরোপ্লাসটিড (Chloroplastid) থাকে— এই ক্লোরোপ্লাসটিড গাছের শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুতে সাহায্য করে। এবং সেইজন্যেই উদ্ভিদ্‌ খাদ্যের দিক থেকে স্বনির্ভরশীল। প্রাণীকোষে সাইটোপ্লাজমে প্লাসটিড থাকে না। কাজেই তারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে না। তাই খাদ্যের প্রয়োজনে তারা অন্যের উপরে নির্ভরশীল।

অন্যদিকে নিউক্লিয়াস কোষের পরিচালকমণ্ডলী যার অভ্যন্তরে আছে ক্রোমোজোম এবং জিন বা বংশাণু। এরা প্রত্যেকটি কোষের বিভিন্ন কাজ, গুণাগুণ, ঘনত্ব প্রভৃতি নির্ধারণ এবং নির্দেশ করে।

নিউক্লিয়াসটি একটি ঝিল্লী বা মেমব্রেন (Membrane) দ্বারা পরিবেষ্টিত যা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নামে অভিহিত। নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে খুব ঘন সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় ক্রোমোটিন জালিকা দেখা যায়। কোষ বিভাজনের সময়ে এ জালিকাগুলি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোমে পরিণত হয়।

বংশগত উপাদানের বাহক হওয়ার জন্যে ক্রোমোজোমে অন্তর্নিহিত রূপটি লক্ষ্য করা দরকার। ক্রোমোজোমের রাসায়নিক বিশ্লেষণে চার প্রকারের অণু পাওয়া যায়ঃ

১। হিস্টোন (Histone)— অতি নিম্ন আণবিক ওজনবিশিষ্ট প্রোটিন।

২। হিস্টোনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত জটিল ও উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট প্রোটিন।

৩। ডিঅকসিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড।

৪। রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড।

এই চার প্রকারের অণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোজোম গঠন করে। বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে যে পার্থক্য তা ডি এন এর উপরে নির্ভরশীল।

ডি এন এর রাসায়নিক পরিচয়ে দেখা যায় যে, ডি এন এ অত্যন্ত উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ— অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর সংযুক্ত নিউক্লিওটাইড অণুর দ্বারা গঠিত।

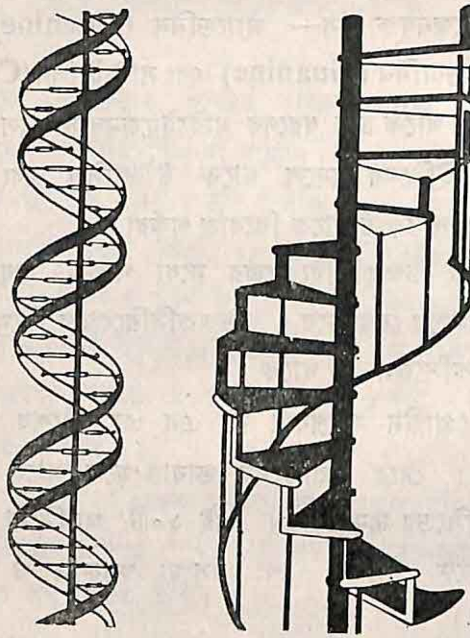
এই সব অণুর মধ্যে আছে ডিঅকসিরিবোজ শর্করা, ফসফরিক অ্যাসিড এবং চার প্রকারের নাইট্রোজেনযুক্ত বেস (Base)। চার ধরণের নাইট্রোজেনযুক্ত বেস— অ্যাডেনিন (Adenine), থাইমিন (Thymine), গুয়ানিন (Guanine) এবং সাইটোসিন (Citosine)। আর এন এ-তেও থাকে চার ধরণের নাইট্রোজেনযুক্ত বেস। পার্থক্য শুধু এখানে থাইমিনের বদলে থাকে ইউরাসিল এবং ডিঅকসি-বিরোজ শর্করার পরিবর্তে থাকে রিবোজ শর্করা।

রিবোজ এবং ডিঅকসিরিবোজের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র একটি অকসিজেন পরমাণুর হেরফেরে। ডিঅকসিরিবোজে রিবোজের চেয়ে এক পরমাণু অকসিজেন কম থাকে।

জীবদেহে প্রোটিন সংশ্লেষণে ডি এন এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। দেহে প্রোটিনের ভাষার মূলে আছে প্রায় ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায়। এই ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায়ের জন্যে বিভিন্ন এবং অসংখ্য আকৃতি ও প্রকৃতিগত প্রোটিনের সৃষ্টি।

প্রোটিন সংশ্লেষণে যে ডি এন এর ভূমিকা সেই ডি এন এর গঠন প্রকৃতি কি রকম? উঁচু বাড়ীর পিছন দিকে যে রকম লোহার ঘোরানো সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকে সংসারের বিভিন্ন অকুলীন কাজে ব্যবহারের জন্যে, ডি এন এর গঠন হল ঠিক সেই সিঁড়ির মতনই। এরা পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন এবং রাসায়নিক দিক দিয়ে একে অন্যের পরিপূরক। ডি এন এর এই পরিচয় দিলেন বৈজ্ঞানিক ওয়াটসন এবং ক্রিক ১৯৫৩ সালে। এর প্রতিটি তন্ত্রী নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায়ে নির্মিত। সর্পিল সিঁড়িতে যেমন বাইরের দিকে দুটি প্রধান রজ্জু (Strand) থাকে ও ভেতরের দিকে থাকে ধাপ, ঠিক অনুরূপ গঠন

ডি এন এরও। ডি এন এর অণুগুলিও দুটি রজ্জুর মত অংশ দিয়ে তৈরী এবং ওই রজ্জু দুটি পরস্পরকে জড়িয়ে একটি জোড়া কুণ্ডলের (Double helix) সৃষ্টি করে। রজ্জুর মত অংশগুলি বেশ দৃঢ় এবং সেগুলি পর্যায়ক্রমে ফসফেট ও ডিঅকসিরিবোজ শর্করা দিয়ে তৈরী। সর্পিল সিঁড়ির ধাপের ন্যায় রজ্জু দুটির মধ্যে আড়াআড়ি সংযোগ



মানুষের তৈরী সিঁড়ি ও দ্বিতন্ত্রী ডি এন এ

স্থাপন করে বেস জোড়াগুলি। প্রতিটি আড়াআড়ি সংযোগে একটি পিউরিন বেসকে একটি পিরামিডিন বেসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দ্বিতন্ত্রী ডি এন এর একটি তন্ত্রীতে ঠিক যেখানে অ্যাডেনিনের অবস্থান, অন্যটির ঠিক বিপরীত অংশে থাইমিন এবং একটির যেখানে গুয়ানিন, দ্বিতীয়টির ঠিক সেখানেই সাইটোসিন। এইভাবে ডি এন এর একটি তন্ত্রী অন্যটির পরিপূরক হিসেবে অবস্থান করে এবং পরস্পরের সঙ্গে এরা হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত থাকে। কি ভাবে পরপর

এই ATGC সাজানো আছে, তার উপরেই বিভিন্ন জীবের ডি এন এর বিভিন্নতা নির্ভর করে। একে বলা হয় সজ্জাক্রম। যে কোনো জীবদেহের ডি এন এ-অণুতে A এর পরিমাণ সকল সময়েই T এর সমান এবং C এর পরিমাণ G এর সমান। একটি ডি এন এ অণুতে বহু সংখ্যক ATGC থাকে এবং তাদের সমবায়ে বহু রকম ডি এন এ হতে পারে। ডি এন এর এই একটিমাত্র গঠনপ্রকৃতিই জীবজগতে বংশধারার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে বহু মৌলিক প্রশ্নের সমাধান করতে সক্ষম। কোষ বিভাজন, বংশজাত ধর্ম, বংশজাত ধর্মের সংমিশ্রণ, বংশজাত ধর্মের স্থায়ী পরিবর্তন ও প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ প্রশ্নের সমাধানের সূত্র আছে ডি এন এর এই গঠনপ্রকৃতির মধ্যে।

জেনেটিক্স সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্র, মঠবাসী মেনডেলের মটর নিয়ে সঙ্কর-প্রজনন অবলম্বনে যার একদিন অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, আজ হরগোবিন্দ খোরানার কৃত্রিম উপায়ে বংশাণু তৈরীর অসামান্য সাফল্য পর্যন্ত তা বিস্তৃত। পথ দীর্ঘ এবং দুর্গমও বটে। এই যাত্রাপথে বংশাণু সম্পর্কে অজস্র তথ্য উদ্ঘাটনে বৈজ্ঞানিকেরা সক্ষম হয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের অধিকাংশেরই ক্রোমোজোমের একটা বিরাট অংশ প্রোটিন দিয়ে তৈরী এবং এই তথ্য ব্যতিক্রমহীন। তাহলে বংশাণুর উপাদানে কি ডি এন এ বা সেই সঙ্গে প্রোটিনেরও অবস্থিতি? এই সংশয়ের অবসান ঘটাল ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) জাতীয় ছোট এককোষী জীব। ভাইরাস (Virus) এবং ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমে কোনো প্রোটিন নেই। কিন্তু ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া জীবন্ত এবং এদের প্রত্যেকেরই আপন আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। সুতরাং.এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত যে, বংশাণুর উপাদান আর যাই হোক, প্রোটিন নয় এবং বর্তমানে গবেষণায় ডি এন এ-ই বংশাণুর উপাদান হিসাবে সুপরিজ্ঞাত।

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ডি এন এ এবং আর এন এর ভাষা নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায়ের উপরেই নির্ভর করে।

ডি এন এর ভাষা যেমন নিউক্লিয়োটাইডের উপরে তেমনি প্রোটিনের ধর্ম নির্ভর করে ২০টি কিম্বা ততোধিক অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায়ের উপরে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায় নির্ণয় করা তো বহু পূর্বে সম্ভব হয়েছে, সাম্প্রতিক কালে নিউক্লিক অ্যাসিডে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায়ও বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেছেন।

আমাদের শরীরে অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন তৈরীর ক্ষেত্রে কতকগুলি স্তর আছে। প্রোটিন তৈরী হয় কতকগুলি ছোট ছোট একক দিয়ে। এদের বলা হয় এক একটি অ্যামিনো অ্যাসিড। বিভিন্ন প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি বিভিন্ন ক্রমানুসারে সাজানো থাকে। কোন্ অ্যামিনো অ্যাসিড কোথায় স্থান পাবে তা স্থির করে জেনেটিক কোড (Genetic code)।

জেনেটিক কোড কি?

জেনেটিক কোড তিনটি করে নিউক্লিয়োটাইডের সমষ্টি যারা সাইটোপ্লাজমে (Cytoplasm) অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরীর সংকেত পাঠায়।

বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন, ডি এন এর যে ATGC বেসগুলি আছে, সেগুলির তিনটি করে একত্রে নিলে বিশেষ একটি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরীর সংকেত হয়। এখন অনেক রকমভাবে এই ত্রয়ীকে সাজানো যায়—যার ফলে সব অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেতই এর মধ্য থেকে পাওয়া গেছে।

আমরা জানি বংশাণুর রাসায়নিক পরিচয়ের বাহক ডি এন এ — যা উদ্ভিদ্‌জগতের এবং প্রাণিজগতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই বৈশিষ্ট্য প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র এবং জন্মগত দিক দিয়ে তাকে আপন স্বকীয়তায় পরিস্ফুট করে। কাকের বাসায় কোকিল

ডিম পাড়লেও তা যে কাক না হয়ে কোকিল হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে সে এই কারণেই। প্রতিটি প্রাণীর প্রোটিনের গঠন তার আপন বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ অনুসারেই চলে। ডি এন এর প্রধান কাজ এই প্রোটিন তৈরীর সংকেত পাঠানো। যে পদ্ধতিতে এই সংকেত যায় তাই হল জেনেটিক কোড। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ প্রোটিন তৈরী হবে এবং তার নির্ভুল সংকেত কোন্ নির্দেশে প্রতিপালিত হয় তা আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

প্রোটিনের প্রধান কাজ হল Enzyme বা উৎসেচক হিসেবে, যা দেহের জৈব রাসায়নিক ঘটনাগুলিকে পরিচালিত করে এবং প্রত্যেককে তার আপন স্বকীয়তায় সুনির্দিষ্ট রাখে। আর কতকগুলি প্রোটিন দেহের গঠনের উপাদান হিসেবে কাজ করে।

বংশাণুর রাসায়নিক পরিচয় ডি এন এ থেকে প্রোটিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ডি এন এ প্রথমে আর এন এ সৃষ্টি করে। এই আর এন এর নাম বার্তাবহ আর এন এ বা messenger RNA, সংক্ষেপে এম আর এন এ। এম আর এন এতে অবস্থিত প্রতি তিনটি নিউক্লিয়োটাইড এক একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের স্থান নির্দেশ করবার শক্তিসম্পন্ন। এইভাবে তিনটি করে নিউক্লিয়োটাইড নিয়ে একটি প্রোটিনের জন্যে যতগুলি সজ্জাক্রম হওয়া দরকার ততগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড যথাস্থানে একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি প্রোটিন উৎপন্ন করে। বিভিন্ন প্রোটিনে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড সুনির্দিষ্টভাবে যে যে স্থানে থাকা উচিত, জেনেটিক কোড ঠিক সেই সেই স্থানে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি সাজিয়ে বিভিন্ন প্রোটিনের শেষ রূপটি দিয়ে থাকে।

এখন এম আর এন এ তৈরী হওয়ার সময়ে যে বংশাণুগুলি কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্যে প্রয়োজন, ডি এন এর সেই অংশে দ্বিতন্ত্রী খুলে যায় এবং অন্য অংশে জোড়া থাকে। এই দ্বিতন্ত্রীর একটি তন্ত্রী (Informational Strand) প্রতিলেখন (Transcription) নামক প্রক্রিয়ায় ডি এন এ থেকে এম আর এন এ তৈরী করে।

তাদের কোডের পর্যায় একই থাকে শুধু পার্থক্য ঘটে থাইমিনের বদলে ইউরাসিলের (Uracil) সন্নিবেশে। এই এম আর এন এ পরবর্তী অধ্যায়ে সাইটোপ্লাজমে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে প্রোটিন তৈরীর পূর্বে নির্দিষ্ট রাইবোজোমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে' একই প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট ট্রানসফার আর এন এ, এম আর এন এর মতই ডি এন এ থেকে তৈরী হতে থাকে। ট্রানসফার আর এন এ বা পরিবাহক আর এন এ সেই সব আর এন এ যেগুলি সাইটো-প্লাজম থেকে এক একটা অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে।

এবারে আসছে রাইবোজোমের কথা। রাইবোজোমের একটি দিক গোল, অন্যদিক ডিম্বাকৃতি। এই ডিম্বাকৃতি অংশের সঙ্গে এম আর এন এ যুক্ত থাকে প্রোটিন সংশ্লেষণের সময়ে।

প্রোটিন সংশ্লেষণের সর্বশেষ পর্যায় হল অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে রাইবোজোমের নিকটে নিয়ে আসা। এ কাজটি করে পরিবাহক আর এন এ। পরিবাহক আর এন এর বিভিন্ন নাম আছে— Soluble, Acceptor, Adapter RNA। পরিবাহক আর এন এর দুটি দিক আছে। একটি দিকে তিনটি নিউক্লিয়োটাইড আছে, সেগুলি বার্তাবহ আর এন এর ত্রয়ী কোডের পরিপূরক (Anti-codon)। অন্য উন্মুক্ত দিকটি অ্যামিনো অ্যাসিড গ্রহণ করবার।

এখন নির্দিষ্ট টি আর এন এ সাইটোপ্লাজম থেকে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড ধরে নিয়ে আসে একটি বিশেষ উৎসেচকের সহায়তায়। এবারে অ্যামিনো অ্যাসিডযুক্ত পরিবাহক আর এন এ বার্তাবহ আর এন এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডযুক্ত বিভিন্ন পরিবাহক আর এন এ বার্তাবহ আর এন এর একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে একে একে সংযোজিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিকে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পেপটাইড রাসায়নিক বন্ধনের সাহায্যে পরপর যুক্ত হতে থাকে।

এইরকম পরপর দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত থাকলে বলা হয় ডাইপেপটাইড, তিনটিকে ট্রাইপেপটাইড এবং আরও বেশী হলে পলিপেপটাইড। যখনই অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়, তৎসংলগ্ন পরিবাহক আর এন এ ঠিক তখনই পরপর বিযুক্ত হতে শুরু করে এবং সর্বশেষে অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডবিশিষ্ট একটা প্রোটিন অণু শৃঙ্খল তৈরী করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বংশাণু নিজে সরাসরি কোনো কাজ করছে না। বংশাণু এম আর এন এর মাধ্যমে উৎসেচক তৈরী করে কাজ করাচ্ছে। কিন্তু একটা বংশাণু কি একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে?

মানুষের গায়ের রং উদাহরণ হিসেবে নিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা চলতে পারে। মানুষের গায়ের রংয়ের ক্ষেত্রে যে রঞ্জকটি দায়ী তার নাম মেলানিন (Melanin)। এটি Amino acid phenylalanine থেকে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়। উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কতকগুলি স্তর আছে এবং প্রত্যেকটি স্তরের জন্যে এক একটি উৎসেচক দায়ী। যদি কোনো একটি স্তরের উৎসেচক স্বাভাবিক না হয়, তাহলে মেলানিন উৎপন্ন হয় না এবং গায়ের রং ধবলগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আমরা জানি একটা বংশাণু একটা উৎসেচক তৈরী করে এবং এখন দেখছি একটা বৈশিষ্ট্য যেমন গায়ের রং বা চোখের রং নিয়ন্ত্রণ করছে একাধিক উৎসেচক। তাহলে একথা বলা যায়, একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করছে একাধিক বংশাণু।

এবারে একটি অঙ্কের হিসেবের সাহায্যে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে তোলা যাক। যদি একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেতে তিনটি নিউক্লিয়োটাইডের বেসের প্রয়োজন হয়, তাহলে ১০০ অ্যামিনো অ্যাসিডযুক্ত উৎসেচক তৈরীর ক্ষেত্রে ৩ × ১০০ অর্থাৎ ৩০০ নিউক্লিয়ার বেসের প্রয়োজন। কিন্তু একটি বংশাণু যদি একটি উৎসেচক নিয়ন্ত্রণ

করে তাহলে দ্বিতন্ত্রী ডি এন এর উপরে সজ্জিত এই ৩০০ জোড়া নিউক্লিয়োটাইডের বেসের সমষ্টিই হল ১০০ অ্যামিনো অ্যাসিডযুক্ত উৎসেচক তৈরী করবার বংশাণু।

উপরের সমস্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, জীবজগতে আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে কোষ অভ্যন্তরস্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কোষ অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাসায়নিক জৈব বিক্রিয়া উৎসেচকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু পুতুলনাচের বাজিকর যেমন পুতুলের ভাগ্য নিয়ন্তা, তেমনই এক্ষেত্রে আসল নিয়ন্তা ডি এন এর রাসায়নিক উপাদান। বংশাণুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবের আকৃতি এবং প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে বংশাণুর রাসায়নিক উপাদানের উপরে নির্ভরশীল এবং সেই উপাদানই বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবদেহের বৈচিত্র্যগুলিকে পরিচালিত অথবা নিয়ন্ত্রিত করে।

সাত

প্রায় একশো বছর আগে জীবকোষের কোষকেন্দ্রে যে ডি এন এ আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা নিয়ে গত তিন শতক ধরে বিজ্ঞানীরা যে ধরণের চিন্তা-ভাবনা করেছেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা প্রায় বিরল। সাঙ্কেতিক নামে এটি DNA হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত। ডি এন এর গুণগত, গঠনগত এবং প্রকৃতিগত গবেষণায় বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত যতখানি উন্নতি লাভ করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে এটিকে বংশানুক্রমের মূলাধার বলা চলে। বংশানুক্রম, বংশপরম্পরায় যা সঞ্চারিত হয়, বর্তমানে কতকগুলি প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করা যায়। ১৯৫৬ সালে ওয়াটসন এবং ক্রিক ডিঅক-সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন প্রকৃতি আবিষ্কার করলেন। সাফল্যের অগ্রগতি অব্যাহত রইল। বিভিন্ন দিক থেকে জীবন রহস্যের এই জটিল বিষয়টির উপরে আলোকপাত হল। পরবর্তী বিজ্ঞানীদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে আমরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁচেছি, যেখানে দাঁড়িয়ে যে কোনো একটি বংশাণুর সংশ্লেষ প্রকৃতপক্ষে কোনো সমস্যাই নয়। প্রকৃতিতে প্রধানত বংশাণু বিভিন্ন প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে? বিক্রিয়া-গুলি নিয়ন্ত্রিত হয় উৎসেচকের মাধ্যমে। এই নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন স্তর আছে। এই স্তরগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু পর্যায়ক্রমে সেগুলি এই রকম ঃ

দ্বিতন্ত্রী ডি এন এ নিউক্লিয়াস থেকে বার্তাবহ আর এন এ (mRNA) পরিবাহক আর এন এ (tRNA) এবং রিবোজোমাল

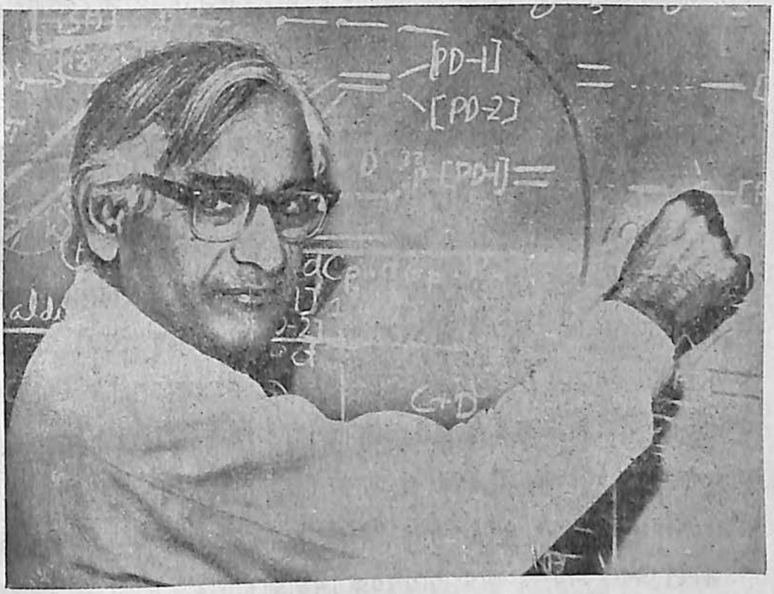
আর এন এ তৈরী করে সাইটোপ্লাজমে পাঠিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এদের মাধ্যমে ডি এন এ বংশানুক্রমের সংকেতগুলিও প্রেরণ করে। বার্তাবহ আর এন এ ডি এন এর সঙ্কেতগুলি নিয়ে সাইটোপ্লাজমে রিবোজোমের উপরে অবস্থান করে। পরিবাহক আর এন এ সঙ্কেত অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে বার্তাবহ আর এন এর উপরে নির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক জায়গায় স্থাপন করে দেয়। এইবারে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটা বড় পলিপেপটাইড (Polypeptide) এবং বৃহত্তর অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খল ও তন্তু গঠন করে, পরিবাহক আর এন এ-গুলিকে আবার মুক্ত করে। বৃহৎ অ্যামিনো অ্যাসিডের তন্তুতে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি বিভিন্নভাবে সজ্জিত হয়ে একটি প্রোটিন অণু গঠন করে। এই প্রোটিন অণু উৎসেচকের কাজ করে। যে কোনো নির্দিষ্ট উৎসেচকের ভিতরে কি প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি সজ্জিত হবে, তার নির্দেশ ডি এন এ অণু থেকে আসে, বার্তাবহ আর এন এর মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে ডি এন এতে অবস্থিত পাশাপাশি তিনটি বেস এক একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রোটিন অণুতে অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে। এই নির্দেশ ডি এন এতে অবস্থিত পাশাপাশি তিনটি বেসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে বেসগুলির সজ্জাক্রমকে অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেত বলা হয়। সঙ্কেতের ক্ষেত্রে তিনটি বেস পাশাপাশি থাকে বলে এই সঙ্কেতটির নাম Triplet Code বা ত্রয়ী সঙ্কেত। এই ত্রয়ী সঙ্কেতের পাঠোদ্ধার হল কি ভাবে?

ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা অ্যামিনো অ্যাসিডের ত্রয়ী সঙ্কেত নির্ধারণের চেষ্টায় মগ্ন হলেন। বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করলেন, জীবনের প্রাথমিক সব লক্ষণযুক্ত কৃত্রিম অণু সৃষ্টি অদূর ভবিষ্যতেই Molecular genetics বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই যে দ্বিতন্ত্রী ডি এন এ গঠনক্ষম চার ধরণের বেসের সকল সমন্বয়ে জীবনের বিভিন্ন সঙ্কেত নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে, ফলে এ কথা সুনিশ্চিত যে, বংশাণুতে নিউক্লিয়োটাইডের সজ্জাক্রম জানার অর্থ

লক্ষ্যের দিকে অনেকদূরে এগিয়ে যাওয়া। এখন এই নির্দিষ্ট সজ্জাক্রম জানা নিউক্লিয়োটাইডযুক্ত বংশাণুর অনুরূপ সজ্জাক্রম তৈরী করে বংশাণুর সংশ্লেষণ এবং টেস্ট টিউবেও জীবন সৃষ্টি সম্ভব।

নিরেনবার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরণের বেস-ত্রয়ী গ্রহণ করে এক



এক ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংকেত আবিষ্কার করলেন। খোরানা প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা দুই তিনটি অথবা চারটি বেসকে পরপর বিভিন্নভাবে সাজিয়ে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেত নির্ধারণ করলেন। তাতে দেখা গেল, যে কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডের ত্রয়ী সঙ্কেত একের বেশী হয়।

খোরানা পঞ্চাশের দশকে নিউক্লিক অ্যাসিডের রাসায়নিক সংশ্লেষণের উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবনের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। নিউক্লিয়োটাইডগুলিকেও ইচ্ছানুযায়ী সঠিক সজ্জাক্রমে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার উপায়ও সেই সময়ে উদ্ভাবিত হল। খোরানা এবং তাঁর সহযোগী গবেষকবৃন্দ সে পদ্ধতিও আবিষ্কার করলেন। এরপর খোরানার গবেষণা-

গারে যখন একদিকে ছোট ছোট ডি এন এ এবং আর এন এ অণুর সংশ্লেষণ সম্ভব হল, তখন অপর দিকে অন্যান্য গবেষণাগারে ডি এন এ পলিমারেজ এবং আর এন এ পলিমারেজ নামক উৎসেচকও উদ্ভাবিত হতে দেখা গেল। পরীক্ষা নিরীক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হল। এখন বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে যথাযথ শৃঙ্খলিত করে ডি এন এ থেকে প্রোটিনে বিভিন্ন বংশবার্তা পরিবাহিত হওয়ার চিত্রটি পরিস্ফুট হবে। খোরানা নির্দিষ্ট সজ্জাক্রমে পলিনিউক্লিয়োটাইডগুলির সংশ্লেষণ করার কথা স্থির করলেন। ডি এন এ থেকে আর এন এতে ও আর এন এ থেকে প্রোটিনে কি ভাবে বংশবার্তা পরিবাহিত হয় তাও পর্যবেক্ষণ করার কথা তিনি মনস্থ করলেন।

এইবার দ্বিতন্ত্রী ডি এন এ অণু নির্মাণ প্রচেষ্টায় জীববিজ্ঞানীরা উদ্যোগী হলেন। কোন্ পদ্ধতিতে তাঁরা ডি এন এ অণু তৈরী করার কথা চিন্তা করলেন? জীববিজ্ঞানীরা কোষে যে ভাবে ডি এন এ প্রোটিন তৈরীর সঙ্কেত পাঠায় তার বিপরীত দিক দিয়ে চেষ্টা করে ডি এন এ অণু তৈরী করতে উদ্যোগী হলেন।

খোরানা প্রথমে একটি পূর্ব নির্ধারিত নিউক্লিয়োটাইড সজ্জাক্রম সংশ্লষেণ এবং তারপর তার পরিপূরক নিউক্লিয়োটাইড সজ্জাক্রম নির্মাণ করলেন। তিনি এই পদ্ধতিতে প্রথমে কয়েকটি নির্দিষ্ট নিউক্লিয়োটাইড নিয়ে তাদের পর পর যুক্ত করে মোটামুটিভাবে কুড়ি নিউক্লিয়োটাইড দৈর্ঘ্যযুক্ত একটি ডি এন এ অণু তৈরী করতে সমর্থ হলেন। এবং এই ক্ষুদ্র ডি এন এ অণুর সাহায্যে পরিপূরক অপর একটি ডি এন এ অণু তন্ত্রীও নির্মিত হল। খোরানা এই দুই ডি এন এ অণু তন্ত্রীকে পরস্পর যুক্ত করে একটি দ্বিতন্ত্রী ডি এন এ তৈরী করলেন। এই দুটি অণু তন্ত্রীর সংযোজন কঠিন নয়। পরিপূরক নিউক্লিয়োটাইড সজ্জাক্রমের জন্যে এদের স্বতঃস্ফূর্ত মিলন ক্ষমতা আছে। ফলে টেস্ট টিউবে সংমিশ্রণে উদ্দিষ্ট ফল পাওয়া যায়। খোরানা দেখালেন যে, টেস্ট টিউবে সৃষ্ট এই দ্বিতন্ত্রী ডি এন এও বার্তাবহ আর এন এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সঙ্কেত পাঠাতে পারে।

টেস্‌ট টিউবে সৃষ্ট হওয়ার পরে দ্বিতন্ত্রী ডি এন এ অণুর দ্বিত্বকরণ চলে ব্যাকটেরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা ডি এন এ পলিমারেজ নামক উৎসেচকের এর সহায়তায়। শুধু দ্বিত্বকরণ নয়, বিবর্ধনও। বিবর্ধিত অণুগুলির অনুকরণ সহজ হল আর এন এ পলিমারেজ নামক উৎসেচক-টির সহায়তায়। এই পদ্ধতিতে খোরানার গবেষণাগারে বিভিন্ন পর্যায়ের নিউক্লিয়োটাইডযুক্ত ডি এন এ অণুর সংশ্লেষণ সম্ভব হল। ষাট দশকের মধ্যম পর্বে সংশ্লেষিত এই ডি এন এ অণুগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। দুটি, তিনটি বা চারটি নিউক্লিয়োটাইডের বারম্বার পুনরাবৃত্তি এগুলিতে লক্ষ্য করা গেল।

এই পুনরাবৃত্ত নিউক্লিয়োটাইডের সজ্জাক্রমযুক্ত ডি এন এর সাহায্যে ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা জেনেটিক কোডের মর্মোদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অসামান্য সাফল্য। এই সাফল্যের জন্য ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্শাল নিরেনবার্গ এবং রবার্ট হোলির সঙ্গে তিনি যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

এই সংশ্লেষণ পদ্ধতির সময়ে তিনি নিউক্লিয়োটাইডের মুক্ত OH, NH_2 and PO_4 মূলকগুলিকে বিভিন্ন আক্রমণাত্মক বিকারক থেকে রক্ষা করবার জন্যে বিভিন্ন প্রকার রক্ষক বিকারক ও সংযোজক বিকারক ব্যবহার করলেন। এখানে নিউক্লিয়োসাইড সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে, পিউরিন অথবা পিরামিডিনের সঙ্গে রিবোস কিম্বা ডি অকসিরিবোস যুক্ত থাকলে নিউক্লিয়োসাইড তৈরী হয়। নিউক্লিয়ো-সাইডে মুক্ত হাইড্রক্‌সিল বা OH মূলক এবং অ্যামিনো বা NH_2 মূলক আছে। সংশ্লেষণের সময়ে এই মূলকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ফসফরিক অ্যাসিডের মাধ্যমে মূলকগুলি নানাভাবে দুটি নিউক্লিয়োসাইডকে যুক্ত হতে বাধা দেয়। ফলে মূলকগুলিকে বিভিন্ন আক্রমণাত্মক বিকারক থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। যার সাহায্যে রক্ষা করা হয়, তাকে বলা হয় রক্ষক-বিকারক। রক্ষক-বিকারকগুলি

ব্যবহার করার একটা স্থবিধা আছে। পলিনিউক্লিয়োটাইড তৈরী হলে রক্ষকবিকারকগুলি সহজে সংশ্লেষিত অণু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায়। খোরানা নির্দিষ্ট ডি এন এ তন্তু তৈরী করবার পরে এই সমস্ত রক্ষক-বিকারকগুলিকে সংশ্লেষিত ডি এন এ অণু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। সংযোজক-বিকারক প্রধানত নিউক্লিয়োটাইড-গুলির মধ্যকার ফসফেট সেতু বন্ধনী তৈরীতে সাহায্য করে। এরা ফসফেট সেতু সংযোজক বিকারক নামে নির্দিষ্ট।

খোরানার পদ্ধতিতে নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষের মূল ধাপগুলি হল ঃ

১। রক্ষক-বিকারকের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন মূলককে রক্ষা করা

২। সংযোজক-বিকারকের সাহায্যে নিউক্লিয়োটাইডের মধ্যে সংযোগসাধন

৩। পর্যায়ক্রমে পলিনিউক্লিয়োটাইডের প্রস্তুতি

৪। পলিনিউক্লিয়োটাইড স্বতন্ত্রীকরণ

৫। পলিনিউক্লিয়োটাইড থেকে রক্ষক-বিকারক বিচ্ছিন্নকরণ

ক্ষুদ্রাকৃতি, দ্বিতন্ত্রী পলিনিউক্লিয়োটাইডের সংযোজন খোরানা কর্তৃক টেস্ট টিউবে সংশ্লেষিত ডি এন এ অণু কোষের মধ্যকার ডি এন এ অণুর সমস্ত গুণ এবং প্রকৃতিযুক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যকার বংশাণুগুলিকে প্রকৃতিজাত বংশাণু বলা চলে না।

এইবারে খোরানা চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন, কি ভাবে কোষের মধ্যকার বংশাণুগুলির বেস সজ্জাক্রমে প্রতিলিপি টেস্ট টিউবে তৈরী করা সম্ভব।

ইতিমধ্যে হোলি প্রকৃতিজাত কোষ মধ্যস্থ একটি অ্যালানিন অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবাহক আর এন এর মধ্যকার বেস সজ্জাক্রম নির্ণয় করতে সমর্থ হলেন। অ্যালানিন পরিবাহক আর এন এ কেবলমাত্র অ্যালানিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবহন করতে পারে। তিনি দেখালেন যে, এই পরিবাহক অম্লটি ৭৭টি নিউক্লিয়ো-

টাইড পরপর যুক্ত হয়ে তৈরী হয়েছে। হোলি ওই আর এন এটির গঠন-প্রকৃতি ও নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায়ক নির্ধারণ করেছিলেন।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ৭৭টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত অ্যালানিন পরিবাহক আর এন এ-তে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় জানা সম্ভব হলেও আরও বৃহৎ দৈর্ঘ্যের নিউক্লিক অ্যাসিডে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ণয় করা নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য। প্রচলিত বিকারকগুলি নিউক্লিক অ্যাসিডকে সুনির্দিষ্টভাবে না ভেঙ্গে বিশৃঙ্খলভাবে ভাঙ্গে বলেই নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। হোলির এই আবিষ্কার খোরানার সম্মুখে প্রকৃতিজাত বংশাণুর সজ্জাক্রম তৈরী করবার দরজা খুলে দিল। খোরানা পূর্বেই পদ্ধতিগত ব্যাপারে তৈরী হয়েছিলেন। একটি প্রকৃতিগত পরিবাহক আর এন এর নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ণীত হওয়ার পরে খোরানা অগ্রসর হলেন। খোরানার উদ্দেশ্য, এমন একটি বংশাণু সংশ্লেষণ করা, যেটি অ্যালানিন-পরিবাহক আর এন এর নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায়ের অনুরূপ। তিনি অ্যালানিন-পরিবাহক আর এন এর পরিপূরক ৭৭টি বেসের নাম ক্রমপর্যায়ে লিখলেন। তারপর প্রতিটি বেসকে টেস্ট টিউবে পর পর যুক্ত করে একটি একতন্ত্রী ডি এন এ তৈরী করলেন। এই একতন্ত্রী ডি এন এ থেকে একটি পরিপূরক তন্ত্রী তৈরী করে তিনি দুটিকে যুক্ত করলেন। একটি দ্বিতন্ত্রী ডি এন এ তৈরী হল। এইবার এই দ্বিতন্ত্রী ডি এন এ থেকে ডি এন এ-নির্ভর আর এন এ-পলিমারেজ দিয়ে একটি পরিবাহক আর এন এ তৈরী করলেন। এই কৃত্রিম আর এন এর মধ্যে হোলির নির্মিত প্রাকৃতিক অ্যালানিন আর এন এর সমস্ত বেসগুলির পরপর সজ্জাক্রম পাওয়া গেল।

যে কৃত্রিম ডি এন এ থেকে এই কৃত্রিম পরিবাহক আর এন এর সৃষ্টি সেটাই হল প্রথম কৃত্রিম সৃষ্ট বংশাণু। কার্যক্ষেত্রে খোরানা এই ৭৭টি নিউক্লিয়োটাইড শৃঙ্খল একসঙ্গে তৈরী করেননি। এগুলি তৈরী

করা হল ছোট ছোট নিউক্লিয়োটাইডের শৃঙ্খলের সাহায্যে। অন্য তন্ত্রীর পরিপূরক অংশেরও সংশ্লেষণ এবং মিশ্রণের সাহায্যে এদের যুগ্ম পর্যায়ে আনা হল। পরবর্তী কার্যক্রমে দ্বিতন্ত্রীর পর পর অংশগুলির মধ্যে রাসায়নিক সংযোজন। এই সংযোজন সম্ভব হল ডি এন এ লাইগেজ নামে একটি উৎসেচকের সাহায্যে। এই যে দ্বিতন্ত্রী ডি এন এ অণুটি তৈরী হল, কোষমধ্যস্থ যে ডি এন এ অণু থেকে অ্যালানিন পরিবাহক আর এন এ তৈরী হয়েছিল এটি প্রকৃতি এবং আকৃতিগতভাবে তারই অনুরূপ। ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের ডি এন এ টেস্ট টিউবে সংশ্লেষণ করলেন খোরানা এবং বার্তাবহ আর এন এর বংশাণুর বেলায় নিউক্লিয়ো-টাইডের যে ক্রমপর্যায় হওয়া সম্ভব সংশ্লেষিত বংশাণুর বেলায় সেই একই ক্রমপর্যায় লক্ষ্য করা গেল। তা ছাড়া প্রকৃতিজাত বংশাণুর ক্ষেত্রে যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তা সম্ভব। প্রয়োজনীয় উৎসেচক এবং অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতিতে বার্তাবহ আর এন এ নিজেই নিজের দ্বিত্বকরণ করতে পারে। খোরানা টেস্ট টিউবে ৭৭টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত ডি এন এ-টি ব্যবহার করে এবং সেই সঙ্গে যা যা প্রয়োজন তা যুক্ত করে অ্যালানিন পরিবাহক আর এন এ তৈরী করলেন। সংশ্লেষিত আর এন এর সক্রিয়তাও পরীক্ষা করা হল। প্রমাণিত হল

ডি এন এ——— আর এন এ——— প্রোটিন

প্রতিলিখন অনুবাদন

এখানে আরও একটি কথা বলবার মত আছে। বংশাণু সংশ্লেষণে যে নিউক্লিয়োটাইডগুলি ব্যবহৃত হল, সেগুলি তত্ত্বগতভাবে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং ফসফরাস থেকে প্রস্তুত করা সম্ভব। তাহলে এ কথা বলা যায় যে, সাধারণ রাসায়নিক উপাদান অবলম্বনে খোরানা টেস্ট টিউবে বংশাণুর সম্পূর্ণ সংশ্লেষণ সম্ভব করে-ছিলেন। তাহলে বংশাণু সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে ভৌত এবং রাসায়নিক সূত্রের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে অলৌকিক কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই। অবশ্য কোষ অভ্যন্তরে সক্রিয় একটি প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ বংশাণু তৈরীর

ক্ষেত্রে এখনও কিছু অসম্পূর্ণতা আছে কিন্তু সময়ে তা নিশ্চয় দূরীভূত হবে।

বংশাণুর রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এর অসামান্য প্রয়োগ সম্ভাবনা আছে। জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং আজ বাস্তবের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁচেছে। ফলে বংশগত রোগ, যা ছিল দুরারোগ্য এবং অসহায় মানুষের কাছে অভিশাপের মত, জেনেটিক্সের প্রয়োগ বিদ্যার উন্নতির ফলে তা নিরাময়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ডায়াবেটিস রোগটি বংশগত, মারাত্মক এবং সমগ্র জীবনের দুর্ভাবনার কারণ। বিজ্ঞানীরা এটির স্থায়ী প্রতিবিধানের জন্যে চিন্তা ভাবনা করছেন।

জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের সাহায্যে এই রোগটির কিভাবে নিরাময় সম্ভব বলার আগে এই রোগ সৃষ্টির কারণটুকু জানা দরকার। ডায়াবেটিস ইনসুলিনের অভাবজনিত রোগ। অগ্ন্যাশয় থেকে এই ইনসুলিনের স্বাভাবিকভাবে সংশ্লেষিত বা নিঃসৃত না হওয়াই রোগটির কারণ। এই ইনসুলিনের গঠন প্রকৃতি কি এবং এর অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায় কি রকম? এটিও বহু পূর্বে নির্ধারিত হয়েছে। তাহলে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রথমে একটি ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের বংশাণু তৈরী করতে হবে, যেটি ইনসুলিন প্রস্তুত করতে সক্ষম। এখন ইনসুলিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্যায় থেকে আর এন এর সম্ভাব্য নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করে পরে ডি এন এর সম্ভাব্য নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করতে হবে। এরপর খোরানার পদ্ধতি অবলম্বন করে পর্যায়ক্রমে ডি এন এ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ডি এন এ সৃষ্টিই সব কথা নয়। এরপর জীবকোষের উপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। সংশ্লেষিত বংশাণুটি কতটা সক্রিয়, কতটা কার্যকর তা পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ। নইলে একটি বিপদ থেকে বহুতর বিপদের আশঙ্কা। সে সব আশঙ্কা থেকে অব্যাহতির জন্যে আরও বিচার বিশ্লেষণের দরকার।

আট

প্রজাতিবিশেষে ক্রোমোজোম-সংখ্যা নির্দিষ্ট। মানুষের দেহকোষে এই ক্রোমোজোম-সংখ্যা ৪৬। ক্রোমোজোমের ব্যতিক্রমে— তার সংখ্যার হেরফেরে বা তার আয়তনের সামান্য পরিবর্তনে বহিঃ-প্রকৃতিতে (Phenotype) প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়— নানা ধরণের বৈলক্ষণ্য পরিস্ফুট হয়। এই সব বৈলক্ষণ্য দেহে যে রোগের সৃষ্টি করে তার নাম সিনড্রোম (Syndrome)। কোনো কোনো সিনড্রোম মানব দেহকোষের অটোজোমজনিত, কোনোটি আবার যৌন ক্রোমোজোম নিয়ন্ত্রিত।

অটোজোমজনিত একটি সিনড্রোমের নাম মঙ্গোলিজম (Mongo-lism)। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কার করেন লুঁজা (Lejeune)। তিনি দেখালেন যে, এই জাতীয় রোগীর ক্ষেত্রে ৪৬টি ক্রোমোজোমের পরিবর্তে ৪৭টি ক্রোমোজোম থাকে। অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি থাকে ২১ (Trisomy) নম্বর অটোজোম জোড়ায়। রোগটির দুর্লক্ষণ কি? এই জাতীয় রোগীরা দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ হয়, এদের মস্তক অনেকটা গোলাকৃতি। সহজে এরা রোগাক্রান্তও হয়, এদের হৃদরোগও দেখা যায়। কিন্তু শিশু হিসেবে এরা হাসিখুশি, সহজে এদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এবং এরা গানবাজনা ভালবাসে। সম্ভবত এই সব লক্ষণই ওই অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটির প্রভাব।

পুরুষ অথবা নারী যে কেউ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে অধিকাংশ আক্রান্তই অল্প বয়সে মারা যায়। বিজ্ঞানীরা

সাধারণভাবে দেখেছেন যে, অতিরিক্ত বয়সের মায়ের গর্ভজাত সন্তানের দেহেই এই সিনড্রোমের সংখ্যাধিক্য ঘটে। যে সব মায়েদের বয়স ২৫ এর কম, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রায় ২০০০ এ ১ জন সন্তানের মাত্র এই সিনড্রোমে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যে সব স্ত্রীলোকের বয়স ৪০ এর উর্ধ্বে তাঁদের ক্ষেত্রে আশঙ্কাটা মারাত্মক।

ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত পরিবর্তন যেমন সিনড্রোম সৃষ্টি করে, তেমনই আকৃতিগত পরিবর্তনও আছে। এই রকম একটি সিনড্রোম সৃষ্টি হয় ৫ সংখ্যক অটোজোমের জন্য। এই সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীরা মানসিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ হয়। রোগাক্রান্তদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এদের কান্না অনেকটা বিড়ালের মেউ মেউয়ের মত। এই ধরণের একটি শিশুকে লক্ষ্য করেন লুঁজা ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে। সিনড্রোমটির নাম দেওয়া হয় 'Cri du chat'।

অটোজোমের মত যৌন ক্রোমোজোম সংক্রান্ত সিনড্রোমও আছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জ্যাকোব (Jacobs) এবং স্ট্রং (Strong) ও ফোর্ড (Ford) সেক্স ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, সকল পুরুষেরই যৌন ক্রোমোজোম XY পর্যায়ের নয়, সকল স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও XX ক্রোমোজোম দৃষ্টিগোচর হয় না। এরকম একটি সিনড্রোমের নাম ক্লাইনেফেলটার-সিনড্রোম (Klinefelter's syndrome)। পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে XY ক্রোমোজোমের পরিবর্তে যখন XXY লক্ষ্য করা যায়, তখনই রোগটির বহিঁলক্ষণ দেখা যায়। এই ক্ষেত্রেও সর্বমোট ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৭।

এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণভাবে বাইরের দিক থেকে পুরুষ মানুষ, কিন্তু সেক্স ক্রোমোজোমের গঠনের জন্যে নারীর গুণযুক্ত। এদের মানসিক রোগ, বন্ধ্যাত্ব, বিশেষভাবে লম্বা পা প্রভৃতি বৈলক্ষণ্য দেখা যায়।

আর একটি সিনড্রোমের কথা বলা যাক। এটির নাম টার্নার

সিনড্রোম (Turner Syndrome)। এইচ এইচ টার্নার নামে একজন বিজ্ঞানী এটি আবিষ্কার করেন বলে তাঁর নামেই এটির নামকরণ। এই সিনড্রোমটিও যৌন ক্রোমোজোমজনিত। এটিতে ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৫। আক্রান্তদের শুধু একটিমাত্র X ক্রোমোজোম থাকে, অন্যটি অনুপস্থিত।

টার্নার সিনড্রোমে আক্রান্তেরা বাহ্যত নারী কিন্তু নারীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যবর্জিত। এরা খর্ব আকৃতিযুক্ত।

ক্রোমোজোমের হেরফেরের জন্যে এই যে বিভিন্ন জাতীয় সিনড্রোম, এ যতই দুর্ভাগ্যজনক হোক, একটা কথা ঠিক যে এ জাতীয় রোগাক্রান্তদের হয় জীবনধারণের ক্ষমতা নেই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশবেই এদের মৃত্যু ঘটে, না হলে এদের যৌন উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। ফলে এগুলিকে জন্মগত রোগ বলা হয়।

কিন্তু যে সব রোগ বংশপরম্পরায় দেখা যায়, সেই রোগগুলিকে কি বলা যায়? নিঃসন্দেহে সেগুলি বংশগত রোগ। বংশগত রোগ জীবনকে অনেক সময়ে অর্থহীন এবং দুর্ভাগ্যজনক করে তোলে। পিতা-মাতার কাছ থেকে সন্তান-সন্ততি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আহরণ করে একটা থাকে, কিন্তু যে সব অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য প্রতিটি বংশপর্যায়ে বা নির্দিষ্ট পর্যায় অন্তর পরিস্ফুট হয় তাকে বংশগত রোগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ স্ত্রীলোকের মধ্যে বেশি, পুরুষদের মধ্যে তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। কোনো বৈশিষ্ট্য আবার পুরুষদের মধ্যেই সাধারণত প্রকাশিত হতে দেখা যায়, স্ত্রীলোকদের মধ্যে নয়। তা ছাড়া কোনো ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এক এক পর্যায় অন্তর। আপাতদৃষ্টিতে বংশধারায় বংশগত রোগপ্রবাহ বিশৃঙ্খল মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বংশধারায় বংশগত রোগপ্রবাহ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে।

এবারে কয়েকটি বংশগত রোগের কথা উল্লেখ করা যাক। বংশগত রোগকে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে।

১। অলিঙ্গ অনুগামী প্রকট বংশাণুজনিত বৈশিষ্ট্য

২। অলিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন বংশাণুজনিত বৈশিষ্ট্য

৩। লিঙ্গ অনুগামী বংশাণুজনিত বৈশিষ্ট্য

প্রথমে অলিঙ্গ অনুগামী বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাক।

হাত পায়ের আঙ্গুলগুলি ছোট হওয়া একটি বংশগত রোগ। এটি ব্র্যাকিড্যাকটিলিজম (Brachydactylism) নামে পরিচিত। কোনো পরিবারের পিতা বা মাতা কেউ যদি এই রোগটিতে আক্রান্ত থাকেন, তাহলে পুত্রকন্যাদের মধ্যে এই রোগটির আত্মপ্রকাশ করার কথা। সাধারণভাবে পুত্র কন্যা নির্বিশেষে অর্ধেক সন্তান-সন্ততি রোগটিতে আক্রান্ত হবে বলা যায়। বংশলতিকায় রোগের ধারা অবলম্বন করে উপর পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হলে রোগটি কোন্ পর্যায়ে কোন্ ব্যক্তির থেকে উৎপত্তি হয়েছে তাও জানা যায়। এই রোগটি অলিঙ্গ অনুগামী প্রকট বংশাণুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এবারে অলিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন বংশাণুর কথা উল্লেখ করা যাক।

কতকগুলি রোগ আছে, অ্যালবিনিজম (Albinism), বিপাক বিশৃঙ্খলাজনিত বংশগত ব্যাধি বা গ্যালাকটোসেমিয়া (Galactosaemia) সুস্থ পরিবারের মধ্যে এগুলির আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে। পূর্বপুরুষের মধ্যে এই সব রোগ অনেক সময়ে লক্ষ্য করা যায় না বটে, কিন্তু এগুলি বংশগত ব্যাধি। অথচ হঠাৎ আকস্মিকভাবে কোনো কোনো পর্যায়ে এদের আত্মপ্রকাশ হয়ে থাকে।

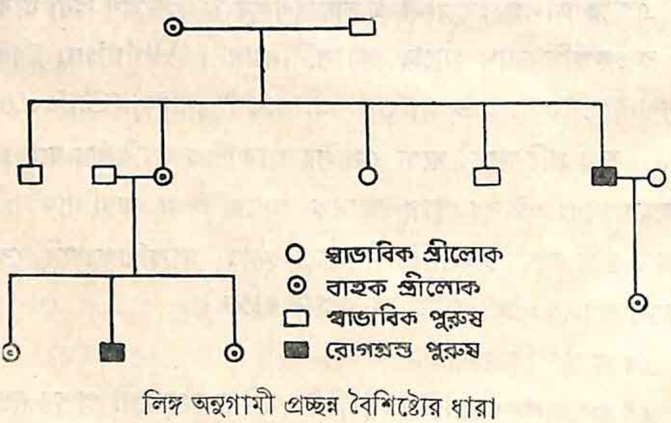
এর কারণ কি?

এই সব বংশগত ব্যাধি বা বৈশিষ্ট্য অলিঙ্গ-অনুগামী প্রচ্ছন্ন বংশাণুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোনো সন্তান যদি মাতা-পিতা দুজনের কাছ থেকেই একই বৈশিষ্ট্যের প্রচ্ছন্ন বংশাণু লাভ করে, তাহলে সেই সন্তানের মধ্যে এই রোগটির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। পুত্র বা কন্যা যে কেউ

এই রোগটিতে আক্রান্ত হতে পারে। পিতা ও মাতা যেখানে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ সেখানে এই রোগের বহিঃপ্রকাশ বেশি ঘটার সম্ভাবনা।

হিমোফিলিয়া (Hæmophilia) রোগটি আমাদের পরিচিত বংশগত রোগ। রক্তের জমাট বাঁধার কৌশলের অস্বাভাবিকতাকেই হিমোফিলিয়া বলে। এই জাতীয় বংশগত রোগ X ক্রোমোজোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন বংশাণুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পুরুষদের মধ্যে সাধারণতঃ এই রোগের প্রকাশ ঘটে থাকে। বংশপরম্পরায় এই রোগটি কি ভাবে অনুসৃত হয়? রোগের বংশগতি লক্ষ্য করলে এই রোগটির ক্ষেত্রে একটি অভিনবত্ব ধরা পড়ে।

রোগাক্রান্ত কোনো পুরুষকে ধরা যাক। স্বাভাবিক কোনো মহিলার সঙ্গে বিবাহবন্ধন হল। তাহলে বিবাহিত জীবনে সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কে কে এই ধরণের রোগে আক্রান্ত হবেন? না, কেউ নয়। বংশলতিকায় এক এক পর্যায় অন্তর রোগটির আবির্ভাব ঘটে। তাহলে এর পরবর্তী পর্যায়ে রোগটির লক্ষণ ফুটে উঠবে।



লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের ধারা

অর্থাৎ পুত্রকন্যাদের পুত্রকন্যা নিয়ে রোগ সম্ভাবনার আলোচনা করা যায়। এখানেও বিবাহবন্ধন স্বাভাবিক পুরুষ বা নারীর সঙ্গে অর্থাৎ রোগাক্রান্ত নন বা রোগের বাহক নন এমন কারো সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক

স্থাপিত হল। এখন প্রথম রোগাক্রান্ত ব্যক্তিটির দৌহিত্র-দৌহিত্রী এবং পৌত্র-পৌত্রীদের মধ্যে কারা রোগাক্রান্ত হবেন ?

রোগটির বৈশিষ্ট্য এই যে, কন্যারা রোগটির বাহক হয়ে থাকেন। তাহলে পুত্রের পুত্রকন্যারা অর্থাৎ পৌত্রপৌত্রীরা রোগটিতে আক্রান্ত হন না বা তাঁদের মধ্যে রোগের প্রকাশ ঘটে না। কন্যাকে অবলম্বন করে রোগের বংশানুস্থতি হয় দৌহিত্রে। তা হলে যে কন্যাটি রোগের বাহক স্বাভাবিক কোনো পুরুষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলে তাঁর পুত্রদের সাধারণভাবে কারো কারো মধ্যে এই রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার কথা এবং কন্যাদের কারো কারো এই রোগের বাহক হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। কিন্তু রোগের বাহক কন্যাটির সঙ্গে যদি কোনো রোগ-গ্রস্ত পুরুষের বিবাহ হয় তাহলে পুত্রসন্তানদের এবং কন্যাদের কারো কারো এই রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার কথা। লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন বংশাণুর ধারা অনুসারে বংশলতিকায় দৌহিত্রে রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠে এবং তা বাহক 'মা'কে অবলম্বন করে।

হিমোফিলিয়ার মত বর্ণান্ধতাও একটি রোগ যেটি X ক্রোমো-জোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন বংশাণু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

Y ক্রোমোজোমে অবস্থিত বংশাণু নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাক এবার।

অনেকের কানে যে চুল দেখা যায় তাও একটি বংশগত বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকারক নয়। মহিলাদের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায় না। কেবলমাত্র পুরুষদের ভিতরে এই বংশজাত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যিনি এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত, বিবাহিত জীবনে তাঁর পুত্রসন্তান সকলের মধ্যেই এই লক্ষণ ফুটে ওঠে। পুত্র-সন্তানদের পুত্রদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পৌত্রদের ক্ষেত্রেও তাই, প্রত্যেকেই এই বৈশিষ্ট্য-যুক্ত। কিন্তু দৌহিত্রদের কারোর মধ্যেই এই লক্ষণ নজরে আসে না।

এই জাতীয় বংশগত বৈশিষ্ট্য Y ক্রোমোজোমে অবস্থিত বংশাণু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মহিলারা Y ক্রোমোজোম বর্জিত। তাহলে Y

ক্রোমোজোম জাত কোনো বংশগত রোগ বা লক্ষণ মহিলাদের মধ্যে দেখা যাবে না, তাঁরা এটির বাহকও হবেন না। পুরুষদের মধ্যে একটিমাত্র Y ক্রোমোজোম আছে। তাহলে বংশাণুটি যুগ্মও নয়। যদি এটির উপস্থিতি থাকে, তাহলে এটির লক্ষণ নিশ্চয় ফুটে উঠবে। এই জাতীয় লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের বেলায় এক ধরণের বিবাহই সম্ভব। তা হল স্বাভাবিক কোনো মেয়েকে বিয়ে করা। সেখানে সব কটি পুত্রই এই লক্ষণবিশিষ্ট হবে।

এই যে প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন বংশাণু, একটা কথা এ সম্পর্কে অনেকেরই মনে হতে পারে যে, বেহিসেবী যৌন মিলনে কি প্রকট বংশাণুরা একদিন সমস্ত প্রচ্ছন্ন বংশাণুকে নিঃশেষিত করে ফেলবে? এমন কি হওয়া সম্ভব যে একদিন সমস্ত প্রচ্ছন্ন বংশাণু অবলুপ্ত হয়ে গেল? বিষয়টি বিখ্যাত গাণিতিক হার্ডির (Hardy) কাছে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্থাপন করা হয়। হার্ডি প্রশ্নটির সমাধান করেন। বললেন, না, দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। জনসংখ্যার বর্তমান যে কাঠামো আছে সেই কাঠামোই বজায় থাকবে বংশধারার পরবর্তী প্রত্যেকটি ধাপে, যদি না বহিঃস্থ কোনো প্রভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইতি-মধ্যে যৌন মিলনের ক্ষেত্রে কোষ্ঠী বিচারের মত জেনেটিক্স সংক্রান্ত বাছ-বিচার শুরু হবে এমন ধরে নেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ পরি-সংখ্যানের ভাষায় যৌন মিলন ঘটবে র‍্যানডম (Random) ভিত্তিতে।

ব্যক্তিগত ভাবে যে বৈশিষ্ট্যগত বংশাণু আমাদের মধ্যে আছে তার খবর আমরা রাখি না, সেইজন্যে তথ্য এবং বাস্তবের মধ্যে গরমিল অল্পই ঘটে।

বংশগত রোগ অনেক, বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত তারা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা তারা অনুসরণ করে চলে। সে ধারাটি সহজ এবং সরল এমন খুব অল্প ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। বরং সে ধারাটি একটি সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করে চলে। পারিবারিক ইতিহাসে রোগের ধারা ভবিষ্যতে সতর্কবাণী হিসেবে কাজ করতে পারে।

নয়

আজ জীবন-রহস্যের অনেক কিছুই ভেদ করা সম্ভব হয়েছে। অনেক কৌতূহলের নিরসন, অনেক প্রশ্নের সমাধান, অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর, জীববিজ্ঞানের জগৎকে বিস্তৃততর, উন্নততর, সুদূরপ্রসারী করে তুলেছে। সম্ভাবনা শতগুণ, সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের বংশগতির ধারক এবং বাহক যে বংশাণু তার গঠন প্রণালী বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা বংশাণুর বার্তা সংকেত বিজ্ঞানীদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে। তা ছাড়া ডি এন এ থেকে আর এন এতে বার্তা পাঠানো, আর এন এ থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণের কৌশল জানার পরিমণ্ডলে এসেছে। ১৯৫৩ সালে ডি এন এর রাসায়নিক গঠন প্রকৃতির পরিচয় দিলেন ওয়াটসন এবং ক্রিক। বংশাণুর স্বাতন্ত্র্য এবং অনুলিপিকরণ এর দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এর পর ১৯৫৬ সালে বৈজ্ঞানিক কোরেনবার্গ ডি এন এ পরিমারেজ জৈব অনুঘটকটি আবিষ্কার করেন। এটি ব্যাকটেরিয়া অন্তর্গত একটি এনজাইম। টেস্‌ট টিউবে এই জৈব অনুঘটকটির সাহায্যে কোরেনবার্গ পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ডি এন এর দ্বিত্বকরণ সম্ভব, ডি এন এ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছে। এই কৌশলে খোরানার গবেষণাগারে বিভিন্ন নিউক্লিয়োটাইডের শৃঙ্খলে ডি এন এ অণুর সংশ্লেষণ রূপায়িত হল। ঘটনাকাল ষাটের দশকের মধ্যম পর্ব। সংশ্লেষিত ডি এন এ অণুগুলির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। দুই, তিন বা চারটি নিউক্লিয়োটাইডের শৃঙ্খলের পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল। এই সব ডি এন এর সাহায্যে খোরানা জেনেটিক কোড সম্পর্কে আলোকপাত

করতে সমর্থ হলেন। এই জন্যে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মারশাল নিরেনবার্গ এবং রবারট হোলির সঙ্গে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

হরগোবিন্দ খোরানার কৃত্রিম ডি এন এ আবিষ্কারের পর থেকে প্রজনন নিয়ন্ত্রণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। যে ডি এন এ নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে, সেই ডি এন এ অণুর ত্রুটি বিচ্যুতিতে নানাবিধ বংশগত ব্যাধি ও অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এই অতিকায় ডি এন এ অণুর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বিভিন্ন বংশগত বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে জানা গেলে, প্রজনন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। তখন ভাইরাসের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রয়োজনীয় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ত্রুটিপূর্ণ ডি এন এ অণুর কৃত্রিম ডি এন এর সংশোধন করা যাবে। বংশগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সম্ভব হবে। এই ডি এন এ অণুর অংশবিশেষের পরিবর্তন করাকে জেনেটিক সারজারি এবং যে চার ধরণের নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমিক সজ্জায় শিকলের মত এই ডি এন এ অণুটি গড়ে ওঠে সামগ্রিকভাবে সেই নিউক্লিয়োটাইডের সজ্জাক্রমের রদবদল করাকে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং বলে। এই পদ্ধতির উন্নতি ঘটলে মানুষ বংশগত ব্যাধি চিরতরে নির্মূল করতে পারবে আর সেই সঙ্গে মানব মনের বহু আকাঙ্খিত, অরডার অনুযায়ী বংশগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। বহু বংশগত ব্যাধি আজ মানবজীবনের এবং সমাজের কাছে অভিশাপের মত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আজ জীবনকে যতই সুন্দর, শুভ্র এবং উজ্জ্বল করে তুলুক, উন্নত বিজ্ঞানের কাছে এ আজও চ্যালেঞ্জস্বরূপ। যে রোগের জন্যে কোনোভাবেই কেউ দায়ী নয়, কেন সেই রোগের দুর্ভাগ্য একজনকে এবং তার উত্তরপুরুষকে বহন করে চলতে হবে? শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্র সম্পর্কে বোঝা যায়, চর্চা এগুলিকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু বংশগত ব্যাধি? যে ভূমিষ্ঠ সন্তান একটি বংশগত ব্যাধি বহন করে নিয়ে এল, তার জন্যে কে দায়ী? আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে,

মাতা-পিতা। কিন্তু মাতা-পিতার ক্ষেত্রেও এই একই প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে। জীবনে বংশগত ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই। মানুষ এখানে একান্ত অসহায়, নিরবলম্ব। ফলে বংশগত ব্যাধি যেদিন নির্মূল করা সম্ভব হবে, জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং সেদিন এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। মানবসমাজ একটি চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে পারবে।

সে এক অতি উল্লেখযোগ্য দিন, সন্দেহ নেই।

অদূর ভবিষ্যতেই তা সম্ভব হবে এমন নয়। কিন্তু সে সম্ভাবনা সীমাহীন অতলান্ত গভীরে এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই।

যেদিন নিউক্লিয়োটাইডের সজ্জাক্রমকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করে সন্তান উৎপাদন সম্ভব হবে সেদিন নিয়ন্ত্রণকারীদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য কি হবে? দেবতার সৃষ্টি? ভয়ঙ্করের জন্ম? বিরল প্রতিভাবানের পরিকল্পনা বা বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত রূপের অঙ্কুরোদ্গম এবং বিকাশ? যে রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়ার, আইনষ্টাইন, নিউটন বিরল, সেই প্রতিভা-বান কি শত-সহস্র সংখ্যায় জন্ম গ্রহণ করে প্রতিভাবানকে নব সংজ্ঞায়িত করে সুলভ করে তুলবে? যে সহস্র সহস্র বংশাণুর বিশেষ সম্মেলনে প্রতিভাবানের সৃষ্টি সেই বিশেষ সম্মেলনের বিশেষত্ব কি ক্ষুণ্ণ হবে? হবে না এমন কথা কে বলবে? যে ব্রেনড্রেন আজ এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সমস্যা অচিরেই নব নব উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধিধারী মানুষের অসংখ্য সৃষ্টিতে বিনষ্ট হবে। একজন, দুজন, তিনজন, চারজন নয়, নব সংজ্ঞায়িত আদর্শের আগমন ঘটবে দেশে দেশে; উন্নত দেশগুলির কর্মক্ষমতায় শত শত, সহস্র সহস্র। প্রতিভার পরিচয় তখন কি হবে? এক অচিন্তনীয়, না অচিন্তনীয় এ কথা এখন আর বলা চলে না, বরং বলা যায় যে এক উজ্জ্বলতম অথচ আশঙ্কাপূর্ণ কৃতিত্বের স্বাক্ষরে মানবজীবন উদ্ভাসিত হবে, নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটবে।

কিন্তু যে নবজীবনটিকে নিয়ে আসা হবে এই পৃথিবীতে তার

পরিচয়টি একবার গ্রহণ করা যাক। যাঁদের নিয়ন্ত্রণে এটি গবেষণাগার থেকে ভূমিষ্ঠ হবে তাঁরা বলবেন, এটিই আদর্শ, প্রকৃষ্ট বা বাঞ্ছিত রূপ। কিন্তু আমার কাছে যা প্রকৃষ্ট অন্যের কাছে সে প্রকৃষ্ট নাও হতে পারে, না হওয়াই সম্ভব। একজনের কাছে বাঞ্ছিত অন্যের কাছে অবাঞ্ছিত, একজনের আদর্শ অন্যজনের কাছে ধর্ষিত। শুধু জন হিসেবে নয়, যুগে যুগে, দেশে দেশেও আদর্শের সংজ্ঞা বদলেছে— সেখানে শাশ্বত বলে কিছু নেই। তাহলে ? সে সৃষ্টি কি মানবহিতৈষী এবং বিজ্ঞানী-দের চিন্তার সাযুজ্য বহন করবে, না, সে সৃষ্টি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ, পার্থক্য এবং ব্যবধান বর্ধিত করবে ?

সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানবকল্যাণ, সার্ব-জনীনতা এবং বিশ্বপ্রেম। কিন্তু সে যদি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম না করে আপন স্বার্থরক্ষায় প্রযুক্ত হয় তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি থাকতে পারে ?

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এরকম সময় আরও এসেছে, এই বিংশ শতাব্দীতেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের কথা মনে পড়ে। যে শক্তি শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের অজস্র সম্ভাবনা বহন করে এবং বর্তমানে যা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তা ধ্বংস-লীলার প্রচণ্ড তাণ্ডবে আত্মমগ্ন ছিল।

ব্যবহারের প্রকৃত এবং যথার্থ অধিকারীর এ আচরণ নয়। সেখানে দৃষ্টি হবে উদার, সঙ্কীর্ণতায় পঙ্কিল নয়, লক্ষ্য হবে মহৎ, স্বার্থান্বেষদুষ্ট নয়, উদ্দেশ্য হবে কল্যাণসাধন, ধ্বংসলীলায় আত্মমগ্ন হওয়া নয়।

কিন্তু সৃষ্টি এবং লক্ষ্যেই সম্পূর্ণতা নেই। আকাঙ্ক্ষিত সৃষ্টি এবং মহৎ লক্ষ্য নিয়েও তাকে লালন পালনের জন্যে অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। কারণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত বাঞ্ছিত সৃষ্টি কতটা বংশগত এবং কতটা পরিবেশগত এ নিয়ে এখনও যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। বস্তুত বংশাণুক্রম ও পরিবেশের মিলিত প্রভাবে মানববৈশিষ্ট্য গঠিত হয়।

শুধু বংশানুক্রম নয়, শুধু পরিবেশ নয়। ফলে উন্নত বিজ্ঞানে এবং অনুন্নত পরিবেশে যে লক্ষ্যের কথা চিন্তা করে বিজ্ঞানীরা অগ্রসর হবেন, সে লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবেন কি না বা পৌঁছোলেও কতখানি পৌঁছোতে পারবেন এ সম্পর্কে সংশয়বোধ হয়। বিজ্ঞান তার আবিষ্কারকে অবলম্বন করে যুগান্ত সৃষ্টি করুক, কিন্তু পরিবেশও উন্নত হোক। সুস্থ সুন্দর ও সহজ পরিবেশ। একে অন্যের পরিপূরক, প্রতিবন্ধক নয়। ফলে বংশানুক্রমের সঙ্গে মানুষ পরিবেশগত যে বৈশিষ্ট্যকে বেশী মর্যাদা দেবে, সৃষ্টি সেই বৈশিষ্ট্যযুক্তই হয়ে উঠবে।

মানুষের চন্দ্র অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনা। কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানের ধারাবাহিক অগ্রগতি কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বরং এগুলির ফল সুদূরপ্রসারী এবং সামাজিক ও মানবিক দিক দিয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানীদের এখানে তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

উদ্ভাবনের দুটি দিক আছে: সৃষ্টি এবং সংহার। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে আমরা তা ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। জীব-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারায় আমরা একদিন এ আশঙ্কার মুখোমুখি হব। আজই নয়, অদূর ভবিষ্যতেও সে সম্ভাবনা আছে এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু অগ্রগতির ধারাটি লক্ষ্য করে এমন কথা বলা অযৌক্তিক নয় যে, একদিন সে ঘটবে। সে এক যুগান্তকারী সাফল্য। কিন্তু সাফল্যের সে দিন যেন ভয়ঙ্কর সুন্দর না হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানের বিশেষ করে জীবনের চিত্ররূপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিজ্ঞানের সাফল্যকে স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে গ্রহণ করার জন্যে সামাজিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। তার সম্ভাবনার দিক, তার আশঙ্কার দিক নিয়ে সচেতনতা ব্যবহারিক দিকটি নিয়ন্ত্রণ করবে। বিষয়টির সীমাহীন গুরুত্ব আছে। একটি সৃষ্টি—সে সৃষ্টি যখন পরিপূর্ণভাবে ইচ্ছানির্ভর হয়ে উঠবে, তখন সে সৃষ্টি কোন্ প্রয়োজনে আত্মপ্রকাশ করবে? কোন্ মন্ত্রশক্তিতে সে দীক্ষিত হয়ে উঠবে? পারমাণবিক শক্তি

শুধু বিস্ফোরণে নয়, আজ মানবকল্যাণে সে বহুমুখী অংশ গ্রহণ করেছে। এই কথাটি মনে রাখা দরকার। যে কোনো শক্তিরই দুটি দিক আছে, সৃষ্টি ও সংহার। সৃষ্টি অর্থাৎ উৎপাদন নয়, মানব কল্যাণমূলক কাজে প্রয়োগ। বংশাণুর কল্যাণকর প্রয়োগ সম্ভব।

বর্তমানে জীববিজ্ঞানের অনেক তথ্যের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়েছে আশু ফললাভের উদ্দেশ্যে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কীটঘ্ন ও প্রতিজীবক ওষুধের সর্বত্র ব্যবহার চলছে। প্রাকৃতিক নিয়মে জীবজগতে একটি সাম্যাবস্থা আছে। অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সে সাম্যাবস্থার ভারসাম্য নষ্ট করে। ভিয়েৎনামে যুদ্ধক্ষেত্র পত্রহীন করার জন্যে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়েছে। ফল শুভ নয়। কল্যাণকারী ফল লক্ষ্য করা যায় এমন দিকও আছে। জীবাণু ও ভাইরাসজনিত রোগের টীকার ব্যাপক ব্যবহারে রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ নিঃসন্দেহে আশু উপকারমূলক। তবে আশু ফলাফল দেখে সুদূরপ্রসারী ফল অনুমান করা সঙ্গত নয়। সেখানে ব্যাপক গবেষণার অবকাশ আছে। বংশাণুর ক্ষেত্রে যে অপব্যবহার তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী এবং মারাত্মক।

আজকের দিনের নবজাতকের মধ্যে শতকরা প্রায় চারজনের মধ্যে কোনো না কোনো বংশাণুজনিত রোগের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এ ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যে কয়েকটি ক্ষতিকর বংশাণু অপ্রকাশিত থাকে। বর্তমানে বংশাণু সম্পর্কে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, অনেক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু মানব সমাজের ক্ষেত্রে এই জ্ঞানের প্রয়োগগত কোনো সাফল্য আজ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি। সুস্থ জীবনের উদ্দেশ্যে একদিন বিজ্ঞানীরা বংশাণুর নিয়ন্ত্রিত পরিব্যক্তি ঘটাবেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অসুবিধাও আছে। রূপান্তকারী পদার্থ সব বংশাণুকেই সমানভাবে প্রভাবিত করে। ফলে স্বাভাবিক বংশাণুর ক্ষতিকর বংশাণুতে রূপান্তরিত হওয়া যেমন সম্ভব তেমনি ক্ষতিকর বংশাণুও সমান সম্ভাবনায় স্বাভাবিক বংশাণুতে রূপান্তরিত হতে পারে।

কিন্তু প্রয়োগগত বিভিন্ন অসুবিধাও একদিন বিজ্ঞানীরা অতিক্রম করবেন। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় প্রতিভাধর এবং কুশলী নাগরিক সৃষ্টি হবে পরিকল্পিত মানবসমাজে। সে কি সকলের অভীপ্সিত না অনাকাঙ্ক্ষিত? সে কি মানবিক বৃত্তি যুক্ত, স্নেহ, মায়া প্রীতিসিঞ্চিত না কি বিজ্ঞানীদের ঘোরতম অংশসমূহে সৃষ্ট?

এ সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় এসেছে। শুধু আবিষ্কারেই কর্তব্য সম্পূর্ণ নয় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রাণী হিসেবে তার মঙ্গল-জনক প্রয়োগের কথাও তাঁদের চিন্তা করতে হবে। সেখানেই আবিষ্কারের চূড়ান্ত সাফল্য।